মরুপলাশ এর বিশেষ প্রকাশনা ‘স্বাধীনতা-২০০৯’

দেশের বিখ্যাত শিল্পী হাশেম খানের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা...

স্বাধীনতার ৩৮বছর

স্বাধীনতার ৩৮বছর পর আজও আমরা আমাদের জাতির পিতাকে চিনতে পারিনি, স্বীকৃতি দিতে পারিনি। নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মকে আমরা আজও সঠিকভাবে জানতে দিতে পারিনি কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি। অথচ আমরা ওদের একটি খন্ডিত ও বিকৃত ইতিহাস শেখানোর অপচেষ্টা চালিয়ে আসছি দেশে-বিদেশে। এ আমাদের দেশের নোংড়া রাজনীতির ফসল। এ আমাদের সীমাহীন দৈন্যতা, ব্যর্থতা!! এখনই সময়, এ সময় জনতার সময়! ওরাই সিদ্ধান্ত নেবে সঠিক ইতিহাস এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে।

আমাদের দেশের নোংড়া রাজনীতি যা গত ৩৮ বছরে করতে পারেনি, এখন দেশের জনগণ তা ৩৮ দিনে করে দেখিয়ে দেবে। ইতিহাস সৃষ্টি করবে। দেশের জনগণ এখন প্রায় প্রতিদিনই ইতিহাস সৃষ্টি করছে। যেমন একাত্তরে পুরো দেশ একত্রিত হয়ে মাত্র নয়মাসের যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি দখলদারদের কাছ থেকে দেশকে মুক্ত-স্বাধীন করেছিলো। এখনও সেই একইভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নতুন একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

একাত্তরে রয়েছে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। তারপর ২০০৬ সালের শেষ পর্বে আর একটি শ্রেষ্ট অর্জন বাঙালি জাতির শান্তিতে নোবেল পুরস্কার, ২০০৭ সালের আর একটি শ্রেষ্ট অর্জন যা আমাদের দেশের টগবগে তরুণ রয়েল বেঙ্গাল টাইগারগন জাতিকে উপহার দিয়েছে তাও আবার ঠিক স্বাধীনতা দিবস'০৭ এর প্রথম প্রহরে, তাহলো ক্রিকেটে বিশ্বের সুপার এইটে খেলার যোগ্যতা অর্জন। অতএব সৎসাহসের সঙ্গেই বলা যায়, আমরাও পারি।

আমাদের দেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের দেশে দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করে ইতিমধ্যেই নিজেদের সৎ ও সাহসী বলে প্রমাণ করেছেন। কুড়িয়েছেন বিশ্বের সীমাহীন প্রশংসা। তারাই আমাদের দেশের এক বিশেষ ক্রান্তি কালে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে হাত দিয়ে ইতিমধ্যেই দেশ-জনতার নব্বইভাগের ও বেশী সমর্থন পেয়েছেন এবং পেয়ে যাবেন। এরাই একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগামী সেনার ভূমিকায় দেশকে মুক্ত করে জাতির কাছে কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। ২৫ফেব্রুয়ারী২০০৯ইং বিডিআর বিদ্রোহে অর্ধ শতাধিক মেধাবী সেনা

অফিসার হারিয়েও চরম এবং পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তারা ধন্যবাদার্হ। দেশের বিভিন্ন দুর্যোগে আমাদের এই সেনাবাহিনী সব সময়ই দুর্গত জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওরাই এই দেশটির শ্রেষ্ট পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার এতোদিনেও পাননি। এ বিষয়ে এখনই নতুন করে ভাবতে হবে।

আমরা এও কামনা করি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা এমনি মর্যাদা পাবে এবং মর্যাদার সঙ্গেই তারা দেশে বসবাস করতে পারবে। সেদিকেও এ সরকার সুনজর দেবেন। দেশের মতো বিদেশেও অনেক অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারাও এই জনগণের সরকারের কাছে তাদের প্রকৃত মর্যাদার দাবী জানাচ্ছে। তবে এ সঙ্গে একটি সতর্ক সংকেত ও দিতে চাই বর্তমান সরকারকে- দেশের মতো বিদেশেও গত পাঁচ-সাত বছরে অনেক অমুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট পেয়েছেন ব্যাঙের ছাড়ার মতো গজিয়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডকাউন্সিল এর বিভিন্ন দেশের ইউনিটগুলোর মাধ্যমে।

যাদের সার্টিফিকেটগুলো আমাদের দেশের আর এক কুলাঙ্গার বিচারপতি ফয়েজীর সার্টিফিকেটের মতোই জাল!!! অথচ এই জাল সার্টিফিকেটধারীরাই দীর্ঘকাল ধরে মুক্তিযোদ্ধার নামে সমস্ত সুযোগসুবিধা হাতিয়ে নিয়েছে। আর প্রকৃত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানগন রয়ে গেছেন তাচ্ছিল্যের অন্ধকারে। তেমনি আমাদের বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশের পদক, স্বাধীনতা পদক গত পাঁচ-সাত বছরে যে সকল অযোগ্যরা হাতিয়ে নিয়েছে, তার সবই বাতিল ঘোষণা করার সুতীব্র দাবী রাখছি।

আজকের মহান এই দিনে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ত্রিশ লাখ প্রাণ হারিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে যে তিন লক্ষাধিক মাবোন। তাদের মরুপলাশ এর সকল লেখকদের পক্ষ হতে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও স্যালুট করছি। শহীদদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি।

আমাদের এই বিশেষ প্রকাশনায় যে সকল লেখকগন অংশ নিয়ে মরুপলাশকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের জানাচ্ছি স্বাধীনতার শুভেচ্ছা। আমরা এই লেখাগুলোর সঙ্গে ব্যবহার করেছি দেশের বিখ্যাত শিল্পী হাশেম খানের দৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীনতার অংকনটি... শিল্পীর কাছে মরুপলাশ কৃতজ্ঞতা ও এক আকাশ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক
মরুপলাশ
রিয়াদ, সউদী আরব।
২৬মার্চ ২০০৯
Email: marupalash@gmail.com
www.marupalash.net

একাত্তরের রজনী
যুথিকা বড়ুয়া

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন কি ভয়াবহ, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তখন আমাদের পরাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশের। গ্রামে-গঞ্জে শহরে চতুর্দিকে গনহত্যা, লুন্ঠন, মা-বোনের সম্ভ্রমহানী, ধর্ষণ, যা আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কম-বেশী অবগত আছি। যখন প্রাণের দায়ে সাধারণ জনগণ নিজের মাতৃভূমি এবং পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে বেছে নিয়েছিল পলায়নের পথ। সেই সময় এক হতভাগ্য দরিদ্র কৃষকের পাঁচ বছরের শিশুপুত্র মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

ধরে নেওয়া যাক, তার নাম কেষ্টচরণ। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মজদুর, খেটে খাওয়া মানুষ। সংসারে স্বচ্ছলতা ছিলনা কিন্তু দুঃখ-দৈনতা তাকে কখনো ঘায়েল করতে পারেনি! তার ছিল অসাধারণ আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল। বাপ-ঠাকুরদার আমলের স্বল্পায়তনে জমিতে আনাজপাতীর চাষ করতেন। থাকতেন খড়-খুটোর ছাউনি দেওয়া একটি ছোট্ট মাটির ঘরে। যেখানে রাজ্যের কীট-পতঙ্গ, কেঁচো, সাপ-ব্যাঁঙ কিলবিল করতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবণতি ঘটলেও তাকে কখনো বিভ্রান্ত করতে পারেনি। কিন্তু রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র শিশু পুত্রকে চিরতরে হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েন শোকাতুর কেষ্টচরণ। যেদিন তার পৈত্রিক ভিটেবাড়ি সহ চাষের জমি পরিত্যাগ করতে তাকে এতটুকু দহন করেনি, পীড়া দেয়নি। বাস্তবের রূঢ়তা, সংকীর্ণতা, অমানবতা এবং হীনমন্যতার ক্ষোভে দুঃখে, শোকে স্ত্রী ও এগারো বছরের কিশোরী কন্যা রজনীর লাজ বাঁচাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন বসতবাড়ি ছেড়ে।

পুত্রশোক বুকে চেপে আঁতঙ্কে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চুপিচুপি গভীর বন জঙ্গালের ভিতর দিয়ে রাতারাতিই যশোর হয়ে এসে পৌঁছায় বেনাপোল সীমান্তে। সেখান থেকে দিনের শেষে দিগন্তের কোলে আঁধার ঢলে পড়লে পুনরায় শুরু করেন তার যাত্রাভিযান। সীমান্তের কর্দমাক্ত এবং কন্টকময় দুর্গমপথ পেরিয়ে ঊষার প্রথম সূর্য্যের আলোয় বনগাঁও হয়ে সরাসরি গিয়ে আশ্রয় নিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের রিফিউজি ক্যাম্পে। কি নোংরা, দুর্গন্ধ তাদের গায়ের জামাকাপড়! আপাদমস্তক রাস্তার ধুলোবালি। রুক্ষশুষ্ক এলোকেশ। অবিশ্রান্ত পদযাত্রায় আর বিনিদ্র রজনী পোহায়ে ক্ষিদায় তৃষ্ণায় দেখতে লাগছিল ভিখারীর মতো। মনে হচ্ছিল, মাটির তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

অগত্যা, করণীয় কিছু নেই। সময়ের নির্মমতা কাঁধে নিয়ে শুরু করলেন নতুন জীবনধারা। বদলে যায়, প্রাত্যাহিক জীবনের কর্মসূচী। অচেনা অজানা জায়গা। নিত্য নতুন অপরিচিত মানুষের আগমন। ভিন্ন মনোবৃত্তি। অনিয়ম বিশৃংঙ্খল পরিবেশ। যেখানকার পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাইয়ে চলা তাদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুস্কর। পদে পদে অপদস্থ। ভাগ্যবিড়ম্বনা। নিয়তি যাদের প্রতিনিয়ত পরিহাস করে, উপহাস করে, দুঃখ-দীনতা কখনো যার পিছুই ছাড়ে না, সে মানুষ সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকেই বা কেমন করে!

একদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রিফিউজি ক্যাম্পেই মহাপ্রয়াণ ঘটে কেষ্টচরণের। আর দুঃখের দহনে করুণ রোদনে জীবনপাত করতে রেখে যান, স্ত্রী সুধারানী ও কন্যা রজনীকে! তখন ওর একেবারে কচি বয়স! বাড়ন্ত শরীর। অপূর্ণ বয়সেই বাঁধ ভাঙ্গা যৌবনের ঢেউ যেন উপছে পড়তে লাগল ওর শরীরে। আর ঐ যৌবনই ছিল রজনীর কালনাগিনী, বিপদ অবশ্যম্ভাবী! যা ও' নিজেও জানতো না। প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত হায়নার মতো লোভাতুর কামপ্রিয় পুরুষেরা ওকে ধাওয়া করতো। যখন ভোগের লালসায় নারী দেহের গন্ধে একজন ভোগ-বিলাসী পুরুষের মনবৃত্তিকে কলুষিত করে। অপবিত্র করে। অবমাননা করে নিজেকে। আর তারই অপকর্মের বীজ রোপণে দুষীত হয় আমাদের সমাজ। যখন বাধ্যতামুলকভাবে নীরিহ, অসহায়, যুবতী মেয়েরা ছদ্মবেশী প্রতারকদের প্রলোভনে বশ্যতার স্বীকার হয়ে পতিত হয়, অনিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তাহীন এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার গুহায়। যা আইনত অপরাধ এবং দন্ডনীয়।

কিন্তু এসব গ্রাহ্য করছে কে! এ তো মনুষ্য চরিত্রের আবহমানকালের চিরাচরিত একটি প্রধান বৈশিষ্ঠও বলা যায়। বিশেষ করে যাদের অন্তরে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধটুকুই থাকেনা। রুচীবোধ থাকেনা। যারা পাপ-পুন্যের ধার ধারেনা। মান-মর্যাদার তোয়াক্কা করেনা। যার অভাবে মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার পরিবর্তে বন্যপশুর মতো অমানবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে হরণ করে বসে তারা নিজেরাই।

রজনী, এক অঁজপাড়া গাঁয়ের অত্যন্ত সহজ সরল নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। বয়সের তুলনায় বিবেক-বুদ্ধি একেবারে ছিল না বললেই চলে। মানুষজন দেখলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতো। মুচকি হাসতো। অথচ ওর শরীরের

গড়ন আর চমকপ্রদ যৌবনের মুগ্ধ আর্কষণে ভ্রমরের মতো মধু শোষণ করতে উড়ে এসে গেঁড়ে বসতে চেয়েছিল, রিফিউজি ক্যাম্পেরই স্বেচ্ছাসেবক নামধারী এক তরুণ যুবক। যেদিন বিপন্ন সময়ের শিকার হয়ে রাতারাতি রিফিউজি ক্যাম্প ছেড়ে শহরের অন্যত্রে গা ঢাকা দিয়ে রজনীকে রক্ষা করেছিলেন ওর গর্ভধারিনী মা, শ্রীমতী সুধারানী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য,তখন ওরা সভ্যসমাজে বাস করবার উপযুক্ত ছিলনা। ভাষা জানতো না। ব্যবহার জানতো না। শুদ্ধ বাংলা বলতে পারতো না। কাপড়-চোপড়ও ঠিক মতো পড়তে জানতো না। থাকতো গুদাম ঘরের মতো স্যাঁতসেতে জায়গায়। যে বাড়িতে মা-মেয়ে দুজনে ঝি-কাজ করতো। দুবেলা এঁটো বাসন মাজতো। মশলা বেটে দিতো। জামা-কাপড় কেঁচে দিতো। অবসরে কাগজের ঠোঁঙ্গা বানাতো। তাতে ক'পয়সা আর উপার্জন হতো! ঘর ভাড়া দিয়ে দুবেলা অন্নও জুটতো না পেট ভরে! শুধু আশ্রয়টুকুই ছিল একমাত্র নিরাপদ।

কাঁধে কলস নিয়ে টাইমকলের জল ভরতে গেলে রজনী একহাত ঘোমটা টেনে বের হতো। আর সেটা পাড়ার ছেলেদের জন্য ছিল, হাসির খোড়াক। ব্যঙ্গ করে বলতো, -'লজ্জাবতী ময়না, কথা কভু কয়না! মন যে কারো সয়না!'

ওরা যে পরিহাস করতো, রঙ্গ-তামাশা করতো, সেটাই মগজে ঢুকতো না রজনীর। উল্টে মজা পেতো! হন্হন্ করে কিছুদুর গিয়ে ঘোমটার আড়ালে মুখ টিপে হাসতো। অথচ বাইরের পৃথিবীর চোখ ধাঁধানো রূপ-রং যখন চোখে লাগল, পৃথিবীকে যখন জানতে শিখলো, বুঝতে শিখলো, মানবাধিকারের দাবিতে মনুষ্যত্বের দাঁড়িপালায় জীবনের যখন মুল্যায়ন করতে শিখলো, রজনী তখন একুশ বছরের পূর্ণ যুবতী! ক্রমান্বয়ে দুর্বিসহ জীবনের একটা সুরাহা খুঁজে পাবার আশায়, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বর্দ্ধিত করার এক অভিনব ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষায় ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের গানি ঝেড়ে ফেলে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো রূপে, গুণে কখন যে চাঙ্গা হয়ে উঠল, নিজেকে পরিপুর্ণভাবে গড়ে তুললো, পাড়া-পর্শী কেউ জানল না। বিস্ময়ে সবাই অভিভুত। যারা ওকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। অবজ্ঞা করতো। যেন এক অজ্ঞাত কূলশীল ভদ্রমহিলা।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত বই "বাল্যশিক্ষা" সকাল সন্ধ্যে দুইবেলা মন্ত্রপাঠের মতো গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করে যতটুকু বিদ্যা অর্জন করেছিল, তাতে শুধু বেশভূষাই নয়, ভাষা, ব্যবহার, চালচলন, কথা বলার ঢং এমনভাবে রপ্ত করে নিলো, সামাজিক রীতি-নীতির কিছু বৈষম্যতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও বেমালুম বদলে গেল রজনী। যেদিন ওর সমগ্র অস্থি-মজ্জা এবং হৃদয়ের কোণে ঘুমিয়ে থাকা চমকপ্রদ প্রতিভার দক্ষতায় অনায়াসে হাসিল করে নিয়েছিল, সভ্যসমাজে বসবাস করবার পুর্ণ অধিকার। যেদিন খুঁজে পেয়েছিল, নিজের অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, বেঁচে থাকার মুল অর্থ! যেদিন ওর চোখের আলোয় দেখতে পেয়েছিল, অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের একফালি খুশীর ঝলক। আর সেই দিনই রজনীর জাগ্রত হয়, প্রখর সংগ্রামী মনোভাব। মানবিক চেতনা।

দিগ্বিবিজয়ের মশাল নিয়ে রজনী বেরিয়ে এলো চার দেওয়ালের বন্ধজীবন থেকে। বেমালুম ভুলে গেল, ওর অতীতের ভাগ্যবিড়ম্বনায় চরম দারিদ্রপীড়িত গ্রাম্য জীবনের দুঃখ দীনতার দিনগুলিকে! ভুলে গেল, শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত নিজের মাতৃভূমিকে! ভুলে গেল, পৃথিবীর মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে! যার সম্মুখে ছিল, এক সুদুর প্রসারী সম্ভাবনার স্বপ্ন ও আশাতীত সফলতা। ক্রমে ক্রমে যে দেশটি ধনধান্যে পুস্পে ভরে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল, সুখ-সমৃদ্ধশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে।

তা হোক, তবু স্বদেশে আর ফিরে যাবেনা রজনী। মাতৃভুমি কখনো আর স্পর্শ করবে না। সেখানে ওর আছেইবা কে? ছিল তো একমাত্র ছোটভাই বিভাষ, ওকে কি ফিরে পাবে কোনদিন? পারবে কেউ ওকে ফিরিয়ে দিতে?
চেয়েছিল, নিজের সততায়, কর্ম দক্ষতায় সাবলম্বী হতে, নিজস্ব মাটিতে শক্তপায়ে দাঁড়াতে। সুশীল সমাজে অবস্থানকারী আর পাঁচজনের মতো পুর্ণ মান-মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মায়ের দুঃখ চিরতরে মুছে দিতে।

কিন্তু বিধির বামে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি! রজনী পারেনি, জীবনকে ইচ্ছেমতো নতুন রূপে, নতুন রঙে সাজাতে। পারেনি, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ওর একান্ত মনবাসনাগুলিকে যথাযথ পুরণ করতে। অবলীলায় মায়ের একান্ত ইচ্ছায় ও পীড়াপীড়িতে ওকে স্বদেশেই ফিরে যেতে হয়েছিল। ভেবেছিল, ফেলে আসা দেশের স্বল্পবিস্তর জমিটুকু নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। ফিরে পাবে নিজের মাতৃভুমি। যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকেই শুরু হবে ওদের পুণর্জীবন।

কিন্তু সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন ছেড়ে কোন্ কুক্ষণে যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল, তার পর দিন ঊষার প্রথম আলো উদ্ভাসিত হবার পুর্বেই নিভে গেল রজনীর অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল আলোর রশ্মি।

নতুন জীবনের আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞতা সাথে নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল, একটি নতুন দিনের, নতুন সুর্য্যের আলো আশায়। স্বদেশের শষ্য-শ্যামল গাঁয়ের সবুজ বনভূমি আর ধানভাঙ্গার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছিল, টেরই পায়নি। সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছাতেই একটি চায়ের দোকানের পাশে ওদের যাত্রীবাহী বাসটি হঠাৎ বিনা নোটিশে থেমে যায়। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শূন্য, নির্জন পরিবেশ। রাস্তার আলোও প্রায় নিভু নিভু। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছিল না কিছু! মাঝে মধ্যে দু-একটা গাড়ি দ্রুত গতীতে পাস করে যাচ্ছিল। সেই সময় কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে সুধারানীও নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে। গিয়েছিল কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসতে। যখন দুস্কচক্রের শিকার হয়ে চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মা-মেয়ে দুজনেই! যা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সুধারানী। এ যেন তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান! ফিরে এসে দ্যাখে, রজনী গাড়িতে নেই! ওর হ্যান্ডব্যাগটা সীটের মধ্যে পড়ে আছে। শীঘ্র ব্যাগটা খুলে দেখল, একখানা কাগজের টুকরো। তাতে লেখা ছিল, 'ছোড়ির তালাশ করবি, খালাশ করে দেবো!'

ততক্ষণে সর্বণাশের কিছুই আর অবশিষ্ঠ নেই রজনীর! সব শেষ! অথচ কত স্বপ্ন, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে বেঁধে ফিরে যাচ্ছিল স্বদেশে। কিন্তু অদৃষ্টের কি লিখন ওর!

ভয়ে-আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল সুধারানীর। চিৎকার করবে, লোকজন জড়ো করবে, সে ক্ষমতাও তখন তার ছিলনা। থর্থর্ করে কাঁপছিল। জমে হীম হয়ে আসছিল সারাশরীর। কিন্তু কি শান্তনা দেবে সে নিজেকে? কি কৈফিয়ৎ দেবে সে এখন নিজেকে? রজনী তো আসতেই চাইছিল না! ওর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে, ওর মরা বাপের দিব্যি দিয়ে, ওকে জবরদস্তী ফিরিয়ে নিয়ে আসছিল দেশে। ওযে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল! জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। এ কি সর্বণাশ করল সে রজনীর? ওকে আর কি ফিরে পাবে কোনদিন? চোখের দেখাও কি আর দেখতে পাবে কোনদিন? ওই তো ছিল জীবনের একমাত্র সম্বল! বেঁচে থাকার শক্তি। সুধারানী বাঁচবে কাকে নিয়ে? বেঁচে থাকবে কি নিয়ে?

কিন্তু জলজ্যান্ত একটা যুবতী মেয়ে মন্ত্রের মতো রাতারাতি গাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল কোথায়? কে নিয়ে গেল ওকে? কারা নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কেন নিয়ে গেল? কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব দেবে কে! এ যে ধুর্ত, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত, তা বুঝতে একটুও দেরী হলো না সুধারানীর। কিন্তু সে যে বড় অসহায়, আশ্রয়হীন, সম্বলহীন, উদ্দেশ্যহীন পথের যাত্রী। অবিরাম পদযাত্রায় যখন যেখানে থমকে দাঁড়ায়, সেটাই তার ক্ষণিকের আশ্রয়, ঠিকানা। যার পৃথিবীতে আর কেউ নেই!

পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তর থেকে আনুমানিকভাবে জানা গিয়েছে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে সীমান্তের গুপ্তচরেরাই রজনীকে সঁপে দেয়, নারী পিপাসু অত্যাচারী পাষন্ডদের হাতে।

যেখানে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মাথাকুটে কেঁদে মরে গেলেও কেউ শুনবে না ওর আর্তনাদ, অনুনয় -বিনয়, আকুতি-মিনতি! যার কোনো খোঁজ-খবর আর পাওয়া যায়নি! রজনী জীবিত কি না, সে খবরও কেউ জানে না!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।
২২ শে মার্চ, ২০০৯,
guddi_2003@hotmail.com

স্বাধীনতা সংগ্রামঃ নারীরা ছিলো অগ্রণী

(সংশোধিত ও বর্ধিত আকারে)

এ. এফ. এম ফতেউল বারী রাজা

পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের ত্যাগতিতিক্ষা, সামাজিক কর্মকাণ্ডের অবদান, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য থাকলেও তাকে দেখা হয় অত্যন্ত খাটো করে। অনেক সময় দেদীপ্যমান অবদানের ইতিহাসকে কালোমোড়কে আচ্ছাদিত করে কেবলমাত্র সম্ভ্রম হারানোর মত ব্যাপার নিয়ে পত্র পত্রিকায় ঘটা করে ফলাও করা হয় এবং বেতার ও দূরদর্শনে প্রচার করা হয়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে সেটাই করা হয়েছে। তাঁদের আত্মদান ও জীবন উৎসর্গের কথা ভুলেও স্বরণ করা হয় নাই। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রে এটাই স্বাভাবিক। তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন নারী, তখন এ ধারা অব্যাহত থাকলে গা শিউরে ওঠে। উপরের কথাগুলো বেজায় তেতোঁ ঠেকলেও সমাজ এবং জাতির বোধদয়ের জন্য বলতে হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগ থেকে রাজপথে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমান অবদান রাখে। তারা শহীদ মিনারে শপথ নিয়ে ৬৯ এর ছাত্র গনআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজপথে অসীম সাহসে ভর করে যারা এগিযে এলেন তাদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, হোসনে আরা, ইসলাম বেবী, সোফিয়া করিম, দীপালী চৌধুরী (চক্রবর্তী), সানজিদা খাতুন, বেগম মুসতারী শফি, রোকেয়া কবির, নাসিমুন আরা হক মিনু, রাশেদা আমীন, ফোরকান বেগম, হাসমত জাহান, সামসুন নাহার ইকো, রোজী বেবী, ফরিদা খানম সাকী, রওশন জাহান সাথী, আভা মর্তেল, রীনা খান, হাজেরা সুলতানা, এ. এন. রাশেদা, কাজী রোজী, খালেদা খানম, সুমিতা নাহা, বেবী মওদুদ, জিয়াউন্নাহার রোজী, সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন, কাজী রোকেয়া সুলতানা, কাজী মমতা হেনা, আয়েশা খানম, জিন্নাতুন নেছা তালুকদার, ফওজিয়া মোসেলম, মাহফুজা খানম, ডাঃ মাখদুমা নার্গিস রত্না, দীপ্তি লোহানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের প্রথমা স্ত্রীর জনমজনমের প্রিয়া বিরোহী সম্রাজ্ঞী নার্গিস আসার খানমও নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এছাড়া আরো অনেক নাম নাজানা নারী একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝে। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন নেত্রী, কেউ সংগঠক, কেউ অংশ গ্রহণকারী।

’৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় হলো। ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্রের ’৭১ এর ১ লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেও বাতিল ঘোষণা করা হলো। বাঙালি বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পশ্চিমা বর্বর গোষ্ঠীর শোষণ হতে মুক্তি লাভের জন্য ক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। মিছিলে মিছিলে মানুষের পদভারে রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। নারীদের মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন মহিয়সী নারী সুফিয়া কামাল। ’৭১ এর মার্চে স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এ সব প্রশিক্ষণে মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া মহিলা পরিষদও ছাত্রীদের অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের EUTC ময়দানে ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। প্রশিক্ষণ শেষে সংগ্রামী নারীরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কাঁধে অস্ত্র নিয়ে রাজপথে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে হয় ২৫ শে মার্চ এর কালো রাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে যে সর্বপ্রথম আত্মাহুতি দেয় তার নাম রওশন আরা। সামছুন নাহার হলের ছাত্রী। আক্রমণের এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় বুকে মাইন বেঁধে একটি পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন । ট্যাংকটি ধ্বংস হয় এবং শহীদ হন রওশন আরা।

হাজেরা বেগম স্বাধীনতা যুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী নামে দ্বিতীয় বৃহত্তর গেরিলা বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দিন আরঞ্জা বীরবিক্রম-এ প্রিয়তমা পত্নী হেমায়েত এমন এক গেরিলা প্রধান, যিনি এক মুহূর্তের জন্য ভারতের মাটিতে পা রাখেননি এবং মিত্র বাহিনীর কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা নেননি। স্বীয় প্রচেষ্টায় দেশের অভ্যন্তরে গড়ে তুলেন বিশাল গেরিলা বাহিনী। সংখ্যার দিক থেকে টাঙ্গাইলের কাদেরীয়া বাহিনী বৃহত্তর গেরিলা বাহিনী হলেও

হেমায়েত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ছিল কাদেরীয়া বাহিনীর চেয়ে অনেক গুন বেশী। স্বাধীনতার বেদীমুল্যে হাজেরা বেগম স্বেচ্ছায় আত্মহুতি দিয়ে স্বামী হেমায়েত উদ্দিনের মুক্তি সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে গেছেন। তার মহান আত্মত্যাগের ফসল হেমায়েত বাহিনী।

বিগত ১৫ ডিসেম্বর ২০০৪ চাঁদপুর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা মঞ্চে ভেদেরগঞ্জ থানার পুর্বাঞ্চলীয় এলএমএফ কমান্ডার মোছলে উদ্দিন মাস্টার প্রধান অতিথি হিসেবে যে স্মৃতিচারণ করেন তা থেকে জানা যায় তিনি শরীয়তপুর জেলার নুরজাহান নামে এক তরুণীর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। নুরজাহান পাক সেনা এবং রাজাকারদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করতো। এক পর্যায়ে রাজাকাররা এ তথ্য জেনে ফেলে এবং পাক সেনাদের ক্যাম্পে সংবাদ পোঁছে দেয়। পাক সেনার একদল এসে নুরজাহান যে বাড়িতে অবস্থান করছিল সেটা ঘিরে ফেলে। উপায় অন্তর না দেখে তাৎক্ষণিক সে নিজের পিস্তল মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে আত্মাহুতি দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংগ্রামী নারীদের জন্য খোলা হয় গোবরা ক্যাম্প। এছাড়া কলকাতা পদ্ম পুকুর এবং পার্ক সার্কাসের তিনজলা ক্যাম্পও খোলা হয়। এসব ক্যাম্পে মহিলাদের নার্সিং, ডিফেন্স ও যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আবার আগরতলায় মহিলারা গড়ে তুলেছিলেন আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী (পুর্বাঞ্চল শাখা)। যাতে সেবাকর্মের পাশাপাশি অস্ত্র পরিচালনা শেখান হয়। '

কমান্ডার করুণা বেগম সম্মুখ যুদ্ধে পা হারিয়ে পঙ্গু জীবন যাপন করেছেন। হামিদা পারভিন, ফাতেমা ও রোকেয়া এই তিন বীর রমনী '৭১ এ হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। আবার ছয় মাস যশোর ক্যান্টনমেন্টে অন্তরীণ থেকেছেন। এ সময় হানাদারদের নখর, বেয়নেটে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁদের শরীর। মার্চের পর লে. মতিউর রহমানের নেতৃত্বে বাঘারপাড়া থানা লুটের অভিযানে অংশ নিয়ে থানার অস্ত্রাগার ভেঙ্গে হাতিয়ে নেন ১৬টি রাইফেল। এর পর চারবার সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। চতুর্থবারে ২৫ জুন তারা ধরে পড়েন। হালিমা এবং ফাতেমা ছিল যশোরের বাঘারপাড়া থানার ইন্দ্রা গ্রামের। আর রোকেয়া বেগম ছিল মালঞ্চ গ্রামের। যশোর শত্রুমুক্ত হলে ৭ই ডিসেম্বর তারা বাড়ি ফিরে আসেন।

পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেছেন আলেয়া বেগম ও শিরিন বানু মিতিল। পাবনার প্রতিরোধ সংগ্রামে শিরিন বানু মিতিল অংশগ্রহণ করেন। তিনি একটি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করেন। তার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহিলা বিভা সরকার, যুথিকা, মনিকা ব্যানার্জি, গীতা, ইরাসহ অনেকের নাম জানা যায়।

বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, গীতা কর, সীতা মজুমদার, মেহেরুন্নেসা মীরা, হালিমা খাতুন, আলমতাজ বেগম ছিলেন গেরিলা যোদ্ধা। মেহেরুন্নেসা মীরা ও হালিমা খাতুনকে ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটি তুলে এনে ১৯৯৯ সালের ২৯ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে সম্মানিত করেন। ফেরদৌস আরা ডলি ১১ নং সেক্টর রণাঙ্গানে হামিদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। ক্যাপ্টেন সিতারা আগরতলায় ফিল্ড হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভুষিত করেন। কুড়িগ্রামের রাজিবপুর থানার শংকর মাধবপুর গ্রামের তারামন বিবি (১৪) ১১ নং সেক্টরের রৌমারী অঞ্চলে ইস্ট বেঙ্গাল রেজিমেন্টের অধীনে সম্মুখ সমরে অংশ নেন। স্বাধীনতার ২৪ বছর পর তিনি মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ স্বীকৃতি বীর প্রতীক খেতাব পান।

খাসিয়া পরিবারের কাঁকন বিবি স্থানীয় কমান্ডারের নেতৃত্বে সিলেটের বিভিন্ন রনাঙ্গাণে যুদ্ধ করেন। তিনি ভিখারিনীর বেশে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও অস্ত্র যোগান দিতেন। শাহানা পারভীন শোভা (শোভারানী) ৩নং সেক্টর কুড়িয়ানা অঞ্চলে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের স্বরুপকাঠির পেয়ারা বাগান এলাকায় অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন।

চাঁদপুরের মোহসিনা বেগম অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অস্ত্র শস্ত্রসহ রাজাকারদের আত্মসমর্পণ করাতে তাঁর ভুমিকা ছিল। ডাঃ বদরুন নাহার মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ভুমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আসমা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন।

আজমেরি ওয়ারেস নিজের জীবন বাজি রেখে একটি গুরুত্বপুর্ণ চিঠি খোঁপার ভেতর লুকিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান হোটেল শেরাটনে) পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। এমন সাহসী আরও নারী ছিল, যেমন ঃ করফুলী বেওয়া, পেয়ারচাঁদ, সৈয়দা জিনাত আরা বেগম প্রমুখ।

এছাড়া ১৯৯১ সালে ফরিদা আক্তার সম্পাদিত ' মহিলা মুক্তিযোদ্ধা' বইয়ে সিরাজগঞ্জের মনিকা মতিনের নাম পাওয়া যায়।

১৯৭১ সালে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা কম হলেও অধিকাংশ নারীরা প্রেরণা, সাহস ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে বোন ভাইকে, প্রেমিকা-প্রেমিককে, স্ত্রী স্বামীকে এবং মাতা তার সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন। আবার তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। অনেকে ভাই, প্রেমিক, স্বামী এবং সন্তানকে হারিয়েছেন। আর কত শিশু হারিয়েছে তাদের পিতাকে। কেউ বহু নির্যাতন সহ্য করে আত্মদানপুর্বক জীবন উৎসর্গ করেছেন। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বড় অসহায় অবস্থায় হানাদার বাহিনী দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪ লক্ষেরও বেশি নারী। এর মধ্যে এক লক্ষ সত্তর হাজার নারীর গর্ভপাত করা হয়েছে। এদের মধ্যে সন্তান গর্ভধারণ ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে অনেকের। যাদের গর্ভপাত করা যায় নি। তাদের অধিকাংশ করেছে আত্মহত্যা।

গভীর বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, দেশের মানুষ বীর বিক্রমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলো বটে কিন্তু যে সমস্ত নারী হানাদার কর্তৃক ধর্ষিত এবং নির্যাতিত হলো তাদেরকে হানাদারদের রক্ষিতা এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করলো তাদের মুক্তিবাহিনীর রক্ষিতা হিসেবে সামাজিকভাবে উপক্ষোর ছলে দেখতে লাগলো। যার জন্য অনেক মুক্তিযোদ্ধা মহিলা তাঁদের পরিচয় চিরদিনের জন্য গোপন করেছেন। তাদের সন্তানরা জানে না মায়ের মহান বীরত্বের কাহিনী। আবার কেউ বিয়ের পর মুক্তিযোদ্ধা ছিল জানা গেলে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছেন। এদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তারা অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছেন। যুদ্ধের পরবর্তীতে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও দেশের মানুষগুলো এ সমস্ত নির্যাতি ত্যাগী বীর রমনীদের সাহস করে বুকে টেনে নিতে পারলো না। যখন তাদের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী শশ্রুষা ও সহমর্মিতার।

অতি আপনজন এবং কাছের মানুষগুলো পর্যন্ত তাঁদের দুরে ঠেলে দিল নিছক অবহেলায়। বাধ্য হয়ে অনেক নারীকে চলে যেতে হলো পাকিস্তানে। সারা জীবনের জন্য বেছে নিতে হলো পতিতাবৃত্তি।

সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার '৭১ এর এই সর্বংসহা মহান আত্মত্যাগী নারীদের নাম-নিশানা এবং সম্ভ্রম হারানোর করুন কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নেই।

তা ছাড়া স্বাধীনতার যত স্মৃতি সৌধ নির্মিত হয়েছে তাতে মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের নাম থাকলেও রওশন আরা, হাজেরা বেগম ও নুরজাহানের মত আত্মত্যাগী নারীদের নাম নেই। অবশ্য রওশন আরা'র বীর শ্রেষ্ঠ, হাজেরা বেগমের বীর উত্তম এবং নুরজাহানের বীর বিক্রম বা বীর প্রতীক খেতাব পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু জাতি সে সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে?
তাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের অবদান কোন অংশেই পুরুষের চেয়ে খাট করে দেখার অবকাশ নেই। অথচ তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ ৩৫ বছর পরও মেলেনি। একজন নারী প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও নির্মিত হয়নি তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কোন একটি স্মৃতি সৌধও।

এমনকি শহীদ বুদ্ধিজীবি হিসেবে সেলিনা পারভীন, মেহেরুন্নিসা, ডাঃ আয়শা বেদোরার নাম তেমনভাবে আজও উচ্চারীত হয় না। তাই আক্ষেপের সাথে জাতীয় কবি নজরুলের 'নারী' কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখ করে আমার লেখার ইতি টানবো -'কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,/ কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।/ কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,/ বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা? ''

ফতেউল বারী রাজা
(নজরুল গবেষক)
চাঁদপুরের একজন বিদগ্ধ লেখক।
ইদানীং তিনি মরুপলাশ এবং রুপসীচাঁদপুর এ একটি কলাম লিখছেন।

মানুষ মানুষের জন্য

মোহসিনা বেগম

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের হুঁশ, বিবেক, বুদ্ধি, বাকশক্তি, লিখনী শক্তি সর্বোপরি মানবতাবোধ যাকে মনুষ্যত্ব বলে থাকে। অন্যের সুখে সুখী হওয়া, অন্যের দুঃখে দুঃখী, মানুষের বিপদ দেখলে বিত্তবান সুখী মানুষগণ সহানুভূতির হাত বাড়াবেন। এটাইতো হওয়া উচিৎ। আমাদের দেশে এর বিপরীতটাও ঘটে কারো কারো বেলায়। কথায় বলে, 'বাঁচতে দেয় না একখানা রুটি, মরলে পরে সাতখানা রুটি।'

এদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কথাটি হাড়ে হাড়ে সত্য। দেশে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার বিত্তহারা হয়ে এক সময় পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও উপার্জন হারিয়ে পথে বসতে দেখেছি। কিংবা দেখেছি অর্থ কষ্টে ধুঁকে ধুঁকে মরে যেতে এক সময়। আমি জানি এদের মধ্যে রয়েছে অনেক শিল্পপতি, লেখক, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক। দেনার দায়ে কাউকে মরতে দেখেছি স্ব-চোখে। এদের মৃত্যুতে ঘটা করে শোক বার্তা, শোক সভা, শোক মিছিল, কুলখানি কত কি? আরো দেখেছি দেশে যখন ওইসব অসুস্থ অভাবী ব্যক্তির নামে কনসার্ট করে টিকিট বিক্রি করে টাকা ওঠানো হয়। ঠিক সে সময় ওইসব মরণ পথ যাত্রীদের দেহ থেকে অত্যন্ত দম্ভের সাথে প্রাণ পাখি বের হয়ে চলে যায় এভবের লীলা সাঙ্গ করে। আমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ জীবিত থাকতে বন্ধুদের খোঁজ রাখিনা, মরলে পরে, পড়ে কি মরি হয়ে করি আনুষ্ঠানিকতা। যা কিনা ওইসব পরিবারের ব্যক্তিদের আর কোন কাজে আসে না।

এ মুহূর্তে ওইসব ব্যক্তির নাম বলে তাদের আত্মাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। ওই ব্যক্তিবর্গ সত্যিই রাজাধিরাজের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গান করে চলে যায়। কি জানি আমরা যারা বেঁচে আছি, এতেও যদি আমাদের জাগরিত হয় মনুষ্যত্ববোধ এটাই হোক আজকের উচ্চারণ-সান্ত্বনা।

আজ এ প্রসঙ্গে নির্মল সেনের একটি কলামের কথা না বলে পারছি না, 'সুনীল কারো কাছে চাকুরি চাইতে আসবে না।' আরো একটি বক্তব্য, 'সেদিন শহীদ মিনারে কবি শামসুর রাহমানের শোকসভায় গিয়েছিলাম। শোক সভায় এক সময় যখন অধ্যাপিকা সানজিদা খাতুন কবির পরিবারের অর্থ কষ্টের কথা বলেছিলেন, তখন একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ ভেসে এলো। একজন লোক বলেছিলেন, সবাই মিথ্যাবাদী। কেউ সত্য কথা বলছেন না। কবির পরিবার এতো অর্থ কষ্টে থাকতে পারে না। যদি সত্যি সত্যি কবির পরিবার অর্থ কষ্টে থাকতো, তা হলে সমগ্র বাঙালি জাতি পঞ্চাশ পয়সা কর দিলে কবির পরিবারের জন্যে সাড়ে সাত কোটি টাকা উঠতো।

এ কাজটি কেউ করেনি। আজকে শহীদ মিনারে যারা অশ্রু সজল চোখে ভাষণ দিচ্ছেন, তারা সবাই ভÊ। কবির জন্যে কিছুই করেননি। এ ভদ্র লোকটির নাম এনামুল হক ওমর, বাড়ি বগুড়া, পেশায়-তবলাবাদক। নির্মল সেন লোকটির সঙ্গে আলাপ করেছেন। ওই লোকটির একমাত্র দাবি ছিলো, এসব ভÛের মুখোশ তুলে ধরতে হবে। নির্মল সেনের আরো একটি আক্ষেপমুলক প্রতিবেদন, ৩০ আগস্ট সাংবাদিক সুনীল ব্যানার্জীর মৃত্যুর পর আমার এ কথা মনে হয়েছিলো, তার মৃত্যুতে শোকবাণীর বহর দেখে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, সুনীল অসুস্থ ছিলো।

তার মারাত্মক রোগ হয়েছিলো। বিদেশে চিকিৎসা করা হয়েছিলো। সে বিদেশে থেকে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন রোগে মারা যাননি। তিনি মারা গেছেন বড় দুঃখে-কষ্টে, একটি চাকুরি না পেয়ে। দীর্ঘদিন তিনি চাকুরির চেষ্টা করেছেন। জনকণ্ঠ থেকে তার চাকুরি যাওয়ায় সে দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছেন। কেউ চাকুরি দেয়নি। সাতক্ষীরার ধনাঢ্য পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সুনীল ব্যানার্জী। চাকুরীর অন্বেষণে ঢাকায় আসেননি। মরে গেলে শোক সভা, শোক বার্তা, শোক মিছিল, মিলাদ কত কি ? এ সব প্রহসন না করে আসুন, আমরা 'মানুষ মানুষের জন্য' এ সত্য উচ্চারণকে সামনে রেখে বেঁচে থাকতেই সবাই সবার কুশল বিনিময় ও খোঁজ খরব রাখি।

অর্থ দিয়ে না পারলে সহযোগীতার ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেই। দশের লাঠি একের বোঝা। কোন কাজ একা সমাধান দিতে না পারলে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সকল সমস্যার মর্মমুলে পৌঁছে গিয়ে বের করি অনন্য সমাধান। তাহলে দেখবেন আপনি আমি সবাই হাসি মুখে বাঁচতে পারবো। হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করবো। কারো কোন অভিযোগ থাকবে না। আর যেন আমরা বার বার একই ভুল না করি, অন্ততঃ বেঁচে থাকতে আমরা মানুষের মুল্যায়ন করি। সুনীল তারুণ্যের উন্মাদনায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে

প্রতিযোগীতামুলক পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ বিভাগে চাকুরি পেয়েছিলো। কিন্তু পিতার তীব্র আপত্তিতে সে পুলিশ বিভাগের চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলো।

নির্মল সেন সুনীলের বিয়েতে গিয়েছেন অর্থাৎ তার জীবনের সব অনুষ্ঠানে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। তাই নির্মল সেন অনেকের কাছে সুনীলের চাকুরির জন্যে অনুরোধ করেও ফল পাননি। তাই সুনীল চাকুরী না পাওয়ায়, সেই না পাওয়া বেদনায়ই চীর বিদায় নিয়েছে।
নির্মল সেন আক্ষেপ করেই লিখেছিলেন, ‘সুনীল আর কারো কাছে চাকুরি চাইতে আসবে না।’ তার প্রিয় দেশবাসী ! সুনীলের ন্যায় চাকুরির জন্যে হন্যে হয়ে আর কোনো নাগরিক তার নাগরিক অধিকার যেন বঞ্চিত হয়ে চীর বিদায় নিতে না হয়।

মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে মানুষের মর্যাদা দেই। মরে গিয়ে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক মর্যাদায় কী হবে তাতে? একজন মুক্তিযোদ্ধা যাকে আমি স্বচোখে দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে বক্ষ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অর্থাভাবে সুচিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর বিদায় বেলায় কফিন রেখে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। শুধু এটুকুনের যোগ্য ছিলো সে ? মুক্তিযুদ্ধ ছিলো সময়ের দাবি। বাঙালির জাতীয়তাবোধ, চেতনা, এটা অবশ্যই অহঙ্কারের বিষয়। কিন্তু এ মুক্তিযোদ্ধা ইস্যু নিয়ে অনেককে আখের গোছাতে দেখেছি। দ্বিধাবিভক্ত হতে দেখেছি কমান্ডারদেরও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখেছি। যারা সে সময় কোনো অবদানই রাখেনি তাদের হাতে সার্টিফিকেট। ছিঃ লজ্জা! আজ নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলতে লজ্জা হয়। কিছু সার্থন্বেষী মানুষের কার্যকলাপে ধিক্কার আসে।

আসুন আমরা দুঃখ ধরার ছলনায় নিজের হাতের মুঠোয় ছায়া না ধরি। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক, সবাই মানুষ এ চেতনায় নিজেকে গড়ি, তথা দেশটাকেও। আর যেন কাউকে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। নীরব অভিমানে বিদায় নিতে না হয়। আমরা সবাই মানুষ মানুষের মতো বাঁচি। এ দৃঢ় অনড় প্রত্যয় নিয়ে মরা নদীতে জোয়ার আনি বা আনবো ইনশাল্লাহ। সদা থাকবো সৎ, দেবো সত্য ভাষণ। সততা ও নিষ্ঠার সাথে সবাই সবার জন্যে এগুবো। যে যেখানে আছি সেখানে থেকে ইচ্ছা করলে নিজের জন্যে পরিবারের জন্যে, দেশ ও দশের জন্যে কিছু হলেও করতে পারি। দেশটাকে গড়তে পারি। এ আমার আশা, এ আমার প্রত্যাশা।

মোহসিনা বেগম
কবি, লেখক ও শিল্পী
চাকুরিজীবী।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গর্বিত বাঙালি

নুরুন্নাহার (মুন্নি)

বাংলাদেশ একটি নাম। পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে স্বাধীনতার চেতনায় জাগ্রত এক রক্তাক্ত ইতিহাসের নাম। কোটি কোটি বাঙালীর অস্তিত্বের সাথে মিশে যাওয়া এক করুণ, লোমহর্ষক, ত্যাগী, অমর স্মৃতিকথার নাম। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে উদিত এক বিজয় সূর্যের নাম। কিন্তু কেনো এতো সংগ্রাম, এতো আত্মত্যাগ? কিভাবে এর শুরু, কিভাবে শেষ ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন আজো লুকায়িত এদেশের প্রবীন থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের সর্বজনের কাছে।

মানুষ ভিত্তিহীন বন্ধন থেকে, সকল কুসংস্কার থেকে, দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। মাথা উচুঁ করে অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। আর এ বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনে সে যুদ্ধ করে জীবন দিতেও প্রস্তুত। ঠিক একই কারণে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধ, তথা মুক্তিযুদ্ধ। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রয়েছে এক ঐতিহাসিক পটভূমি। বহুল পরিচিত জ্ঞানী মনিষীদের বিবরণ থেকে জানা যায়; স্বাধীনতার সেই বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৭৫৭ সালের দিকে। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন এক ষড়যন্ত্রমুলক যুদ্ধে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পরাজিত হন ইংরেজদের হাতে।

সেদিন থেকে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। বাঙালি জাতি চলে আসে ইংরেজদের শাসনাধীনে। মেনে নেয় তাদের এই পরাজিত পঞ্জুত্ব। দু'শ বছর তাদের পৈশাচিক, অমানুষিক আর বিজাতীয় শাসন, শোষন, বঞ্চনা, আপমান ও নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নিষ্পেষিত হয়েছে বাঙালি জাতি। মনের গহিন কোনে আমৃত্যু লালন করা স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ, পুঞ্জীভূত আকাঙ্খা, মুক্তির স্বাদ-ই দেশের মানুষের মনের বিক্ষোভ আর আন্দোলনের চেতনাকে করেছে সংগ্রামী। আর এর ফলেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের একাংশরূপে জন্ম নেয় পুর্ব পাকিস্তান।

কিন্তু হায়,একি দুর্ভাগ্য! নামমাত্র স্বাধীন হয়েই পরে রইল পুর্ব পাকিস্তান। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে রেখে ইংরেজ শাসকদের মতোই শোসনের আর এক নতুন করুণ ইতিহাসের সুচনা করে। বৈষম্যের জাল বিস্তার করে এদেশের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক মর্যাদা, মৌলিক চাহিদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের কঠোর হিংস্র থাবায় দাবিয়ে রাখতে এতটুকুও কৃপনতা করেনি তারা। সর্বক্ষেত্রে চরম অবহেলায় লাঞ্ছিত হয়ে মনের সেই কষ্ট আর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের অধিকার আদায় আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী সৃষ্টি হয় ভাষা এক রক্তিম সংগ্রাম। ১৯৫২সালে ২১ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের অগ্রযাত্রার এক বিরাট এবং অকুতোভয়ী বীরত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগের চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির আন্দোলন এবং জাতীয় চেতনার বিজয় ঘোষিত হয়, শুরু হয় দমননীতি।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দেশ নিরবচ্ছিন্ন সামরিক শাসনে চলতে থাকে। এই শাসনের কবল থেকে নিস্তার পেতে এবং বিভিন্ন অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৬৯ সালে শুরু হয় গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল জনসমর্থন লাভ করলেও ইয়াহিয়া সরকার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দিবে, এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। শুরু হয় তার কুচক্রি কার্যক্রম। এর ফলেই বাঙালির মনে অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে স্তব্দ করার লক্ষ্যে, ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া সরকারের পোষাবাহিনী চালায় এদেশের ইতিহাসের এক বর্বরতম, নিষ্ঠুর গণহত্যা।

মর্মান্তিক কষ্টের ঐ কালো রাতে একমাত্র ঢাকাতেই হত্যা করা হয়েছিল ৫০ হাজার মানুষ। ২৫শে মার্চ রাত্রি ১২ টা ২০ মিনিটে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পুর্বে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষনা দেন এবং বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার আহবান জানান। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান সর্বপ্রথম ২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনা প্রচার করেন এবং শেষ বার্তাটি টি.এন্ড.টি'র মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

পরে ২৭ মার্চ বঙ্গাবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান আরও একটি ঘোষনা প্রচার করেন।

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষনাটি বঙ্গাবন্ধুর পক্ষে হলেও এটা ছিলো সময়োপযোগী এবং মুক্তিযুদ্ধের চালিকাশক্তি। কারণ নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞে হতভম্ব হয়ে যাওয়া মানুষের মনে প্রাণে তার এই ঘোষনা, শক্তি আর সাহসের সঞ্চার করেছিল। আর তার পরপরই বাংলার কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত সংগ্রামে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারেঁ এসে পৌঁছে। ফলে পাকবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ৪.৩০ মিনিটে ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাক সেনাপ্রধান নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। ঐ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক। দীর্ঘ ৯ মাসের সংগ্রামের ঘটে অবসান। জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলার মুক্ত আকাশে উদিত হয় নতুন স্বাধীন রক্তিম সূর্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রাধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সেই বেতার ভাষনের কথা বাঙালি জাতির স্মৃতিতে আজো অম্লান হয়ে আছে যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের নিকট নতুন প্রানের সঞ্চার করে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সেইসব বীর শহীদদের কথা, সেই সব অসীম সাহসী যোদ্ধাদের কথা, যারা তাদের আত্মবলিদানের জন্যে অমর হয়েছেন; তারা আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন চিরকাল" মুক্তিসংগ্রামী সাহসী যোদ্ধারা জীবন দিয়ে তাদের চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছেন সত্যি কিন্তু এই চেতনা কতটুকু অটুট ও অক্ষত থাকতে পারবে তা আমাদের বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবে, সঠিক তথ্য দিয়ে তুলে ধরাটা যদিও কষ্টসাধ্য তবুও বাংলার নতুন প্রজন্মের দু'হাতে তুলে দিতে হবে মুক্তিসংগ্রামের আরো ছোট-বড়, লুকানো গোপন সঠিক তথ্য, সঠিক ইতিহাস।

কারণ নতুন প্রজন্মের মাঝেও অরাজকতা আর নৈরাজ্যের জাল বিস্তার করে সৃষ্টি করছে নতুন নতুন রাজাকারদের রুপ। সৃষ্টি করছে দেশবিরোধী মানসীকতার হিংস্র কতক মানুষরুপী পশুর। যারা বিদেশের মাটিতে এদেশের ইতিহাসকে করে লজ্জিত। বিভিন্ন অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে যারা থাকে সচেষ্ট। আর যেনো নতুন কোন দেশদ্রোহী সৃষ্টি না হয়, দেশে যেনো অরাজকতা প্রশ্রয় না পায় সেজন্য প্রয়োজন এদেশের স্ব্বধীনতার সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া। যাতে সকল প্রজন্ম উপলব্দি করতে পারে আমাদের এই অর্জিত স্বাধীনতায় এ দেশ কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে। আর এর জন্য প্রয়োজন উদ্যম, সাধনা, প্রবীনদের সহযোগীতা ইত্যাদি। তবেই সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাঙ্গালির মনে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে
উৎকণ্ঠার দিনগুলি

পীযূষ কান্তিরায় চৌধুরী

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যুক্তফ্রন্ট, আইয়ুব শাসন, আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা, গণঅভ্যুত্থান, ৬ দফা ১১দফা সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বাঙালীর বিজয় শেখ মুজিবকে ক্ষমতা না দিয়ে নাটক নাটক খেলা ইয়াহিয়া-ভুট্টো গং। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পশ্চিমাগুষ্ঠি থেকে আলাদা হতে সংগ্রামেক ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু। আলোচনার টেবিলে পিন্ডি-ঢাকা নাটকের বৈঠক। সর্বশেষ ২৫ শে মার্চ ইয়াহিয়ার পশ্চিমা বাহিনী পাঞ্জাবী সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজারবাদ পুলিশ লাইনে।

আর্মি কেন্টনম্যান্টে বন্দি করলো বাঙালী সেনাদের রাজপথে টেংক, কামান, নামিয়ে নরহত্যা আরম্ভ করলো। সেই রাতেই বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন মাধ্যমে বাঙালী জাতীর উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাঁচা মরার লড়াই। পশ্চিমাদের শোষন নির্যাতন থেকে মুক্তি হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে যেন মোকাবেলা করে "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।"

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেল পাঞ্জাবী বাহিনী। পরবর্তীতে জানা গেল বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। মুক্তিযুদ্ধ দিন দিন তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগলো। ভারতের সীমান্ত উন্মুক্ত রাজনৈতিক, ছাত্র, জনতা, তরুন-তরুনী ঢুকে পড়লো এবং সংখ্যালঘুরা বসতবাড়ী ছেড়ে পাঞ্জাবীদের অত্যাচারে প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে শরনার্থী হয়ে ভারত সরকারকে চাপ দিতে লাগলো। মুক্ত স্বদেশের জন্য সাহায্য চাইলো।

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ইয়াহিয়াকে সাহায্য করতে সপ্তম নৌ-বহর পাঠালো বাঙালী জাতীকে নিধন করার জন্যে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রনাঙ্গণে লড়াই করে যাচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মুক্তিযুদ্ধাদের মিত্র বাহিনী হয়ে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে আরো শক্তি সঞ্চয় করে পাঞ্জাবী বাহিনীকে হটিয়ে মুক্ত করে নিচ্ছে এককেটি অঞ্চল। ভারতীয় সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাতেও আঘাত আরম্ভ করেছে। যুদ্ধের তীব্রতায় সারা বিশ্ব কেঁপে উঠেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটচাল আরম্ভ করলো। ভারতকে যুদ্ধ বিরতীর প্রস্তাব দিল। ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশকে সাহায্য বন্ধ করতে হবে। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল দিনটি খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের জাল শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো দেয়। পোল্যান্ড বিপক্ষে ভোট দেয়। ভোটদানে বিরতথাকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্রের নীল নকশার ষড়যন্ত্র ভেঙে গেল। পাকিস্তানী ইয়াহিয়ার হাত ভেঙে গেল। সপ্তম নৌ-বহর থেমে গেল। চীন পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভেটো দেয় কিন্তু টিকে নি।

চীন পাকিস্তানকে সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এদিকে পাকিস্তানের সামরিক আদালতের বঙ্গবন্ধুর বিচার কার্য্য শেষ করে তাঁকে কবর দেওয়া হবে। কবর খোঁড়া হচ্ছে। কিন্তু থমকে গেল ইয়াহিয়া।

পাঠক বৃন্দ ৩৫ বছর পর বিজয়ের মাসে আমি সর্বশেষ অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কি করে বিজয়ের দিনটি এলো তার পুর্বে ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ এই তিন চার দিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কিছু অংশ তুলে ধরেছি। পূর্ব পাকিস্তানের রাণাঙ্গানে যুদ্ধ চলছে। বিমান বন্দরে পালাবার মত কোনোও পাক বিমান নেই। মাথার উপরে ভারতীয় বিমান। সমুদ্রে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অবরোধ। স্থলপথে মানুষের হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। নিয়াজী বুঝেছে মার্কিন সপ্তম নৌ-বহরের সাহায্য আশা করা যায় না। ইয়াহিয়ার মসনদ টলটলায়মান।

১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় পিন্ডিকে বলেছিলেন সকাল ৯টার মধ্যে বেতারে জানাতে হবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করেছেন কিনা। এটা বেতার ফ্রিকোয়েন্সীতেও বলে দিয়েছিলেন। জানা যায়, নিয়াজী সে দিন সারারাত ধরে ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এব্যাপারে বিভিন্ন দুতাবাসেও সাহায্য নেয়। কিন্তু কোন ফলই হয়নি। ইয়াহিয়া খানকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন মিত্র বাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজ বারছে এবং পাক বাহিনীতে ত্রাসও বাড়ছে।

ঢাকায় অসামরিক পাকিস্তানীরাও আত্মসমর্পনের পক্ষে চাপ দিচ্ছে। চাপ দিচ্ছে কয়েকটি বিদেশী দুতাবাসও। সকালে নিয়াজী আবার কয়েকটি দুতাবাসের সাথে কথা বলল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির হল মানেকশর প্রস্তাবই মেনে নেবে। তখন শুরু হল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগের চেষ্টা। কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে নিয়াজী বার বার সেই চেষ্টা করলেন। সকাল প্রায় সোয়া আটটা। কিন্তু যোগাযোগ করা গেল না। নটা যখন বাজে বাজে তখন গোটা ঢাকা আকাশবাণীর কলকাতার ষ্টেশণ খুলে কান পেতে বসে রয়েছে।

তারাও ভীষন ভীত। তারাও বুঝতে পারছিলেন ঢাকার লড়াই যদি হয়ই তাহলে তাদের অনেকের প্রাণ যাবে। তারা তখন জানতে একান্ত আগ্রহী নিয়াজী মানেকশর প্রস্তাব রাজ হয় কিনা। কিন্তু হায় নটার সংবাদে আকাশবাণীর বাংলা সংবাদে জানতে পারেন নিয়াজী কোন জবাবই দেন নি। বিমান আক্রমনের সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে। ঠিক তখনই নিয়াজী মিত্র বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে। জানিয়ে দিয়েছে তার বাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করবে। তখনই ঠিক হল বেলা ১২ টায় মিত্রবাহিনীর চিফ-অব-ষ্টাফ জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যাবেন। নিয়াজীর সঙ্গে আত্মসমর্পনের ব্যাপারটা পাকা করবেন। এদিকে চাঁদপুর, আখাউড়া, বি.বাড়িয়া, আরো কয়েকটি অঞ্চল মুক্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ থেমে নেই। ঐদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায় মীরপুরের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের উপর নাগরার বাহিনীর আটকা পড়েছিল। টঙ্গীর কাছাকাছি নদির উপরের ব্রিজটি পাকিস্তানীরা ভেঙ্গে দিয়েছিল। ১৬ তারিখ ভোরে নাগরার বাহিনী নয়াহাট ফরেষ্ট রোড দিয়ে সাভারের কাছাকাছি এসে ঢাকা-আরিচার রোডের উপর এসে পড়লো। পাক বাহিনী এই রাস্তায় ভারতীয় বাহিনীকে আশাই করেনি। প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং ব্রিজ গুলিও ভাঙ্গে নি। আরিচা ঘাট রোডে পরে গান্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগিয়ে গেল।

মাত্র কয়েক মাইল। প্রথমেই মিরপুর পাক বাহিনীর জেনারেল জামশেদ সেখানে গিয়ে নাগরার কাছে আত্মসমর্পন করলো। নাগরার বাহিনী ঢাকা ঢোকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিককপ্টারে ঢাকা পৌছলেন। নিয়াজীর সঙ্গে কর্মকর্তা পাকা হল। আত্মসমর্পনের দলিল তৈরী হল জেনভা কনভেনশন আইনে। বিকাল ৪টা নাগাদ সদরবলে ঢাকা পৌছলেন মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা। ৪ঃ২১ মিনিট ঢাকা রেসকোর্স জনতার জয় বাংলা ধ্বনীর মধ্যে নিয়াজী আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পন করলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পাক-বাহিনীর কাছে ততক্ষনে আত্মসমর্পনের নির্দেশ চলে গিয়েছে।

সে দিন লড়াই চলছিল শুধু চট্টগ্রাম ও খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান ওই দিন সকালে নিজ থেকেই আত্মসমর্পন করছিল মধুমতি নদীর পুর্বতীরে। চট্টগ্রাম শহরেও তখন ভারতীয় সৈন্য প্রায় ঢুকে পড়েছিল। আর খুলনার পাক-বাহিনীর একটি অংশ তখন খালিসপুরের অবাঙ্গালী জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। নিয়াজির আত্মসমর্পনের পর সব যুদ্ধই থেকে গেল। ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।

পরিশেষে বলতে হয় ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মিত্র বাহিনী ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সারা বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং তার দেশে ১ কোটি শরনার্থির চাপ কমাতে দ্বারে দ্বারে ঘুরে সমর্থন যুগিয়েছেন। ভারতীয় লোকসভায় দৃপ্তকণ্ঠে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীকে পুর্ণাঙ্গরুপে সাহায্য করার ঘোষনা দেন।

লোকসভার সদস্যরা তুমুল অভিনন্দন জানান। "জয় বাংলাদেশ" ধ্বনিতে দশ দিগন্তে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ভারত সরকার বাংলাদেশ একটি নতুন রাষ্ট, একটি ভু-খন্ড, একটি পতাকায় উড়বে স্বীকৃতি দিল। ৭ ডিসেম্বর ভুটান রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়ে দিল বাংলাদেশকে। এই দিন গুলি আমাদের মাঝে উলেখযোগ্য। সুতরাং ডিসেম্বর মাসটিই আমাদের উৎকণ্ঠা এবং আনন্দের বিজয় উলাসের দিন। সেই সময়ে আমি কবিতা গানে লিখেছিলাম-

দুর্জয় ঘাটি মোরা গড়েছি, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়েছি-
এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো মুক্তি সেনা................।।

(২)

আরেকটি বিজয় দিবস দরকার

বিজয়ের মাস আনন্দ বেদনা ভরা। এ মাসটিতে ১৬ ডিসেম্বরকে পালন করে বিজয় দিবস হিসেবে। ৩৫বছর অতিক্রান্ত হল কিন্তু বিজয় মাসে ভুলতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধে আড়াই লক্ষ আত্মত্যাগকারী পরিবারের মা,বাবা,পুত্র সন্তান, মেয়ে,দাদা-দাদি আত্মীয় স্বজন। আর ভুলতে পারেনি প্রায় ত্রিশ লক্ষ মা, বোনদের ইজ্জত লুটের ঘটনাগুলি। চোখের জলে বাধ মানেনা পুত্র কন্যা হারা মায়ের, স্বামী হারা স্ত্রীর। কেউ যায় কবর জিয়ারত করতে, কেউ যায়

মাজার,মন্দিরে। স্বাধীনতার স্বাদ ওরা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি। ওরা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তাদের কিছু অংশ আত্মসমর্পন করেছে এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

তাঁদের সাথে আমাদের ভাষাগত, সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অর্থাৎ পশ্চিমা উর্দ্দু ভাষীদের কুটচালে বিপদগামী ধর্মের দোহাই গ্রহন কারি কিছু পক্ষলম্বনকারী মুসলিম ভাই এদশেই বসবাস করছেন। তাদেরকে পাশ্চমে নিয়ে যায়নি। রক্ত বীজের তুল্য হিসেবে রেখে গিয়েছে। এরাই বর্তমান অশান্তির মূল। ১৯৭৫ সালে জাতীর জনক বঙ্গাবন্ধুকে বিভিন্ন কৌশলে স্বপরিবারে হত্যা করে। রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গো যায়।

ধর্মের দোহাই দিয় সেই স্বাধীনতার বিপক্ষে দেশীয় ভাইরা সঙ্গাবন্ধ হয়ে রাষ্ট্রের ইতিহাসের চাকা ঘুড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠে। আজো সেই কুটচাল শেষ হয়নি। ইতিহাস বিকৃতি করা মৌলবাদ, জঙ্গী বাহিনী আল-কায়দার দোসর দেরকে পবিত্র বাংলাদেশে ঢুকিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার নীল নকশা তৈরী করে হত্যা, ধর্ষন, লুটপাট অস্ত্র আমদানীকরে গোপন ঘাটি সৃষ্টি করে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিনত করতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে।

জঙ্গী বাহিনীর প্রধান ধরাপরেছে বিচারে ফাঁসির আদেশও হয়েছে কিন্তু জামাই আদর পেয়ে যাচ্ছে। বাঁধা আর বাঁধা কেন? কারণ সেই বিপক্ষ শক্তির নীলনকশা রাষ্ট্রের প্রতিটি সর্বোচ্চ আসনে বহাল তবিয়তে বসে মুচকী হাসি দিচ্ছে, যেন প্রেতাত্মার হাসি। এখন দেখা যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি এটা প্রাথমিক বিজয় দিবস। রাষ্ট্রের শান্তির লক্ষ্যে

আমাদের সঙ্গাবন্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে। সেটাই হবে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মাস ও দিবস । আসুন মুক্তিযোদ্ধের স্বপক্ষের এবং এ দেশের স্বদেশ ভুমিকে যারা ভালোবাসেন তারা সেই বিপক্ষের অশান্তির শক্তিগুলোকে প্রতিহত করি। একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করি।

(৩)

“মহেন্দ্রক্ষণ কখন আসবে”

আমরা দু’জনে একসঙ্গো পড়াতাম। সুমির বাবা একজন সরকারী কর্মচারী। এখানে সুমির বাবা তীর্ঘ ৬ বছর যাবত চাকরী করার সুবাদে তাদের পরিবারের সাথে আমার একটি অন্তরঙ্গতা ছিল। পড়ালেখায় দু’জনেই প্রথম থেকে চতুর্থের মধ্যে থাকতাম। সুমি স্কুলে গান করতো যেদিন আমাদের বিতর্কের ক্লাস হত। আর আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম, মাঝে মধ্যে নাটকও করতাম।

দু’জনেই প্রগতি বাদী ছিলাম। সমাজতন্ত্রের তখন জয় জয়কার। একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনে প্রভাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যেতাম। সুমি খুব ভাল মেয়। কাথ কথায় রেগে যেতো না। হাসি মাখা মুখ ছিল। আর মাত্র দু’বছর পর কলেজে যাবো। ভয় ও আনন্দের মাঝে মনের দুয়ারে উঁকি দিত। ভালবাসা কি ব্যর্থ হবে? কলেজে কি সুমিকে পাবনা ?

১৯৭১ সাল রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙ্গো গিয়েছে। নির্বাচনে কৌশল ক্ষমতার লড়াই। বঙ্গাবন্ধুকে ক্ষমতা দিবেনা। অবরোধ,হরতাল, কারফিও, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, বিহারী-বাঙ্গালী হত্যা যজ্ঞ চলছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। মানুষের মনে শান্তি নেই। উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। স্কুল কলেজ বন্ধ। বঙ্গাবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতার দৃড় প্রত্যয় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দামাল ছেলেরা, অফিস আদালত বন্ধ। ২৫শে মার্চ রাত্রিতে মুক্তিযুদ্ধে জাঁপিয়ে পড়তে ঘোষনা দেওয়া হল। পঞ্জাবীদের আর বিহারীদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে মানুষ গুলি বাড়ি ঘর ছাড়া হচ্ছে। সুমির বাবাকে বিহারীরা হত্যাকরতে কয়েক বার বাড়ি ঘেড়াও করেছিল কিন্তু পায়নি। আমি একদিন বললাম কাকা বাবু এভবে বাঁচা যাবেনা। ওরা হত্যা ও লাঞ্চিত করবে। চরুল অনেক মানুষ ভারতে যাচ্ছে।

আমরাও যাচ্ছি। সেখানে জীবন রক্ষায় শরনার্থী হয়ে থাকবো। আপনিও চাকুরী করতে পারবেন না। জীবনটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। সুমির বাবা ভেবে চিন্তে রাজী হয়ে গেল। দিনক্ষন ঠিক হল। একদিন আমি আমার বৃদ্ধ মা ও বাবাকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে সূর্য্য উঠার পুবৃক্ষনে যাত্রা করলাম। সাথে সুমি তার ছোট ভাই-বোন ও বাবা-মা। সীমান্ত পার হলাম। শরনাথী হিসেবে ভারতের কার্ড গ্রহন করলাম। জীবনের ঝুঁকি থেকে সাময়িক রক্ষা পেলাম। শরনাথী শিবিরে উঠে গেলাম। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনী হয়ে

যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি ও সুমি শরনার্থী শিবিরে রেশনিং কাজে চাকুরী পেয়ে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারলামনা। বাবা-মা বৃদ্ধ। সুমির বাবা নিকটবর্তী জয়বাংলা অফিসে চাকুরী পেল।

দিন গড়িয়ে মাস যাচ্ছে। প্রতিদিনের রনাঙ্গানের খবর পেলাম রেডিওতে এবং জয় বাংলা পত্রিকা এবং রণাঙ্গান থেকে পত্রিকা ও আনন্দ বাজার পত্রিকায় খবরগুলো পেয়ে এবং শুনে আনন্দ লাগালো হঠাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে শুরতে পেলাম পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয় বরন করে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন করছে। শিবিরে আনন্দের ঢেউ লেগে গেল। প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমরা উভয় পরিবার শরনার্থী শিবির ছেড়ে চলে এলাম মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে। চারিদিকে মুক্তিবাহিনীরা রাজাকার খুজে হত্যা করছে। কেউ কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যারা বাড়ী ঘর দখল করেছিল তারা ছুটে পালাচ্ছে। সুমির বাবা চাকুরীতে যোগদান করলো।

একদিন সুমির বাবা এসে আমার বাবাকে বলল আপনাদের সাহায্য ভুলবার নয়। আমার মেয়ে আপনার ছেলে যেন দুটি একই ভাবাদর্শে তৈরী। আজ আমার একটি ছোট্ট কথা আপনাকে রাখতে হবে। বলুন নিরাশ করবেন না। আমার বাবা বলল দেখুন একসাথে ছিলাম, আপনার সুমিকে আমি খুব ভালোবাসি আদর করি। আজ যখন এসেছেন কথাটা বলেই ফেলি। বলুন- আপনার সুমিকে পুত্র বধু করবো। আপত্তি নেই তো ? সুমির বাবা রাজি হলেন। তবে আরো চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন ওরা পড়ালেখা করুক। সময় পার হল। মহেন্দক্ষন চলে এল। সুমির সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। এ মিলনে সবাই আনন্দিত হল। কিন্তু স্বাধীন বাংলার কপালে একি দেখছি!! আমরা কী স্বাধীন হয়েছি?

পীযূষ কান্তিরায় চৌধুরী
আলীম পাড়া, হাজী মহসীন রোড
চাঁদপুর।

রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা

সাইফ মুন্না

বিজয়ের এই দিনে প্রথমেই স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ বাঙালী দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা দামাল ছেলেদের, যাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় এবং আমাদের স্বাধীনতা। স্মরণ করছি সেই দু'লক্ষ মা-বোনকে যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই বিজয় এবং স্বাধীনতা। স্বরন করছি সেই মহান নেতা যার যোগ্য ও বলিষ্ট নের্তৃত্বে অর্জিত বিজয় এবং আমাদের স্বাধীনতা। সেই মহান নেতা বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে।

বিজয় মানে কোন কিছু জয় করা, কোন কিছু অর্জন করা, বিজয় মানে আনন্দে উদ্বেলিত হওয়া। সব বিজয়েই আনন্দ আছে, তবে স্বাধীনতা অর্জনের বিজয়ের আনন্দ পৃথিবীতে কয়টা জাতি উপভোগ করেছে বা পৃথিবীর কত ভাগ লোক উপভোগ করেছে, বলা যদিও কঠিন, বা এ বিজয় যে কত আনন্দের হতে পারে তা কয়টি জাতিই বা জানে, কিন্তু বাঙালী জাতির পুরো একশত ভাগ জানে স্বাধীনতা অর্জনের বিজয়ে আনন্দ কি, বা কতটা উদ্বেলিত হতে পারে এ অর্জনে, তা বাঙালী জাতি ছাড়া আর কোন জাতি এমনভাবে উপলব্ধি পারেনি বা পারবেনা। আমাদের এ বিজয় এমনি-এমনি চলে আসেনি, আমাদের এ বিজয়ের জন্য জীবন দিতে হয়েছে ত্রিশ লক্ষ বাঙালীকে, ইজ্জত হারিয়েছে দু-লক্ষ মা-বোন। স্বাধীনতা অর্জন করেছে অনেক দেশ, মহাদেশ, অনেক জাতি, কিন্তু অর্জনের ধরনটা ভিন্ন। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা নিরস্ত্র ছিল কিন্তু দেশ স্বাধীন করেছে এবং অর্জন করেছে সেই কাংখিত বিজয়, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা মাত্র নয় মাসে অর্জন করেছে স্বাধীনতা এবং অর্জন করেছে সেই কাংখিত বিজয়।

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা বাঁশের লাঠিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে নিজেদের অস্তিত্ত রক্ষার জন্য বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং সেই কাংখিত বিজয়ের জন্যম পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যে জাতি শুধু একজন নেতাকেই দিয়ে দিতে পারে দেশ স্বাধীনের গুরুদায়িত্ব এবং সেই বিজয় অর্জনের গুরু দায়িত্ব, যার মুখের কথায় পুরো একটা জাতি নিঃদ্বিধায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল জীবন মৃত্যুর সন্ধিঃক্ষনে। আর সেই মহান নেতা বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগ্য নের্তৃত্বের মধ্য দিয়ে মানুষের সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন চুড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পনের মধ্যদিয়ে অর্জিত হয় আমাদের সেই কাংখিত ঐতিহাসিক বিজয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় কাংখিত বিজয় অর্জনে যে কজন মহান দেশ প্রেমিক নেতা এ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ্য নের্তৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের চুড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় যে নামটি বার বার উচ্চারিত হয়েছে তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এক কথায় বলা যায়, যে নেতার জন্ম না হলে আমারা পেতামনা একটা স্বাধীন ভুখন্ড, আমরা পেতামনা লাল সবুজের একটা পতাকা, আমরা পেতামনা একটা ভাষা, আমরা পেতামনা বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাড়ানোর সুযোগ। আমরা পেতামনা আমাদের নায্য অধিকার।

কিন্তু আজ প্রশ্ন বিদ্ধ করা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার চেতনা ও স্বাধীনতার মুল্যবোধকে। কি পেলাম আমরা আমাদের স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরে, আমরা কতটুকু পেরেছি আমাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে, আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে, কতটুকু পেরেছি আমরা আমাদের স্বাধীনতার চেতনা ও মুল্যবোধকে রক্ষা করতে। আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র প্রতিবেদন, শুনেছি আমাদের দেশ প্রেমিক মুক্তি যোদ্ধা দামাল ছেলেদের কথা, কিভাবে আমাদেও দেশ প্রেমিক মুক্তি যোদ্ধা দামাল ছেলেরা সহযোদ্ধার লাশকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে গিয়েছে সামনের দিকে। তার সহযোদ্ধার লাশ তাকে করেনি এতটুকু সংকিত, এতটুকু বিচলিত, কারন তার একটাই লক্ষ, ভাই গেছে যাক, মাকে বাঁচাতে হবে নিজের জীবন দিয়ে হলেও।

তারা বাঁচিয়েছে তাদের মাকে আমাদের প্রীয় জন্মভুমিকে। কে প্রশ্ন বিদ্ধ করতে চাচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার চেতনা ও মুল্যবোধকে। এ প্রশ্নের উত্তর আজ সবার সামনেই আছে। আজ ব্যাঙ্গাত্তক হাসি হাসছে আমাদের স্বাধীনতা, যে দেশ প্রেমিক মুক্তি যোদ্ধা দামাল ছেলেরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন দিয়েছেন সেই বীর সেনানীদের পরিবার, আর যারা পঙ্গু হয়েছেন, সেই পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে আছে আজো, স্বাধীনতা তাদের কাছেও আজ হাস্যরসে পরিনত হবার উপক্রম হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যারা মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে পাক বাহিনীর চেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় ছিল তারা হল পাক হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামস। কিন্তু আজ সেই রাজাকার, আলবদর, আলসামস আমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতার স্বাদ গ্রহন করে, যে লাল সবুজ পতাকার প্রত্যক্ষ বিরোধী ছিল তারা, সেই লাল-সবুজ পতাকা শোভা পায় তাদের গাড়ীতে। তারা পায় স্বাধীন দেশের মন্ত্রির মর্যাদা।

কি নির্মম বাস্তবতা আমাদের। কি জগন্য বাস্তবতা আমাদের। কিভাবে পদ-দলিত করছি আমরা মহান স্বাধীনতাকে, স্বাধীনতার বিজয়কে, মুক্তি যুদ্ধের মহান সৈনিকদের স্বপ্নকে। বিজয় দিবসের আজকের এই দিনে আবারো আমাদেরকে, নতুন প্রজম্মকে শপথ নিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সঠিক পথের দিকে প্রবাহিত করার, স্বাধীনতা বিরোধীদের রুখে দাঁড়াবার। যাতে কলংকিত করতে না পারে আমাদের রক্ত দিয়ে অর্জিত বিজয়কে, আমাদের স্বাধীনতাকে।

আমি স্বাধীনতা দেখিনি তাই আমাকে বলতে হয়ঃ

একাত্তরের মুক্তিসেনা যুদ্ধ আমি দেখি নাই,
তবু মা তোর ধুলোর মাঝে সংগ্রামের ও পরশ পাই।

রিয়াদ-সৌদীআরব

নাসিরকোট ঃ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায় চির অম্লান

ওরা ৯ জন বীর সন্তান

এম. নুরে আলম পাটওয়ারী

“ বীরের এ রক্ত স্রোত
মাতার করুণ আহাজারি
ভগিনীর অশ্রু ধারা
বৃথা যায়নি কোনো দিন
বৃথা যেতে পারে না ” (স্বরচিত)

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর আম্রকাননে মীর জাফরের কৌশলী ষড়যন্ত্রের হাত ধরে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো। তারপর যুগ যুগ ধরে ক্ষুদীরাম, প্রীতিলতা, মাস্টারদা সূর্যসেন, তিতুমীরসহ বহু দেশ প্রেমিক বীরের অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা আর রক্তঢালা স্রোতের ওপর দিয়ে বয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ১৯০ বছরের শাসন-শোষণের বিদায় ঘন্টা বেজে ওঠে ভারতীয় উপমহাদেশে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে পাকিস্তান আর অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে হিন্দুস্থান মানে ভারত নামের দু’টি রাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট।

বিভক্ত ভারতে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামক একটি দেশের দু’টি অংশের মধ্যে দুরত্ব ছিলো ১৪০০ মাইলের অধিক। এছাড়াও ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি সব কিছুতেই ছিলো অমিল। বাঙালিরা লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান। শাসন নামের শোষক রূপে অধিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানীরা, পূর্ব পাকিস্তানীদের (বাঙালিদের) ভাগ্যাকাশে দেখা দিলো কালো মেঘের ঘনঘটা। শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের বাঙালিদের ওপর শোষণ ও বঞ্চনা বুলড্রেজিং আঘাত।

পূর্ব পাকিস্তানকে পরিণত করা হলো সম্রাজ্যবাদী উপনিবেশে। স্বাধীন দেশে বাঙালিরা আরো পরাধীন হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ৭ মাস পর ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে প্রথম বিরোধ দেখা দিলো, ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স মাঠে ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ঘোষণা দিলেন “Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan.” মিঃ জিন্নাহ্র এই স্বার্থপর ঘোষণায় মুহূর্তেই ফুঁসে ওঠলো সারাদেশ। তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে মুখর হলো ছাত্র সমাজ। বাঙালিরা বোকার মতো হা করে রইলো না, বুঝে ওঠলো চুপ করে থাকা যাবে না। আর ঠিক সে সময়েই ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ ঘটলো। তারপর বাঙালি জাতির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ে সৃষ্টি করে এলো ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক আমুল পরিবর্তন এনে দেয়। ভাষার দাবি পরবতীতে বাঁচার দাবিতে রূপ লাভ করে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ধারাবাহিকতায় ও চেতনায় পরবর্তীতে ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ ছয়দফা, ৬৯ গণঅভ্যুথ্যান এবং ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের বাঙালিদের নিরঙ্কুশ জয়লাভ। তারপর ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে টালবাহানা করে স্বৈরাচারী শাসক রাতের অন্ধকারে বাঙালিদের স্তব্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়ে ২৫ মার্চ ১৯৭১ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরতর ও ঘৃণিত হত্যাকাÊ চালায় ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপুর্ণ শহরগুলোতে। বাঙালিরা দমবার পাত্র নয়। মুহুর্তেই টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথরিয়া প্রত্যকটি শহর গ্রামে গঞ্জের মুক্তিকামী মানুষ স্ব স্ব অবস্থান থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য অকুতোভয়ের বেশে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে।

যুদ্ধের পাগল করা দামামা আমাদের চাঁদপুরেও এসে দোল খায়। ৬ এপ্রিল চাঁদপুর পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক প্রথম আক্রমনের শিকার হয়। ওরা পুরাণবাজারে অতর্কিত বোমা বর্ষণ করে। কিন্তু এতে কেউ হতাহত হয়নি। পরদিন ৭ এপ্রিল পাকা হানাদার বাহিনী সড়ক পথে চাঁদপুর প্রবেশ করে। চাঁদপুর গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল হাই স্কুলে ঘাঁটি স্থাপন করে। সাধারণ জনগণ হানাদার বাহিনীর আগমনী বার্তায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু দেশ মাটি ও মাকে মুক্ত করার জন্য চাঁদপুরের বীর সন্তানরা জীবনবাজি রেখে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে প্রত্যেকটি শহর বন্দরসহ প্রতিটি গ্রামে গ্রামে। যার থেকে বাদ যায়নি ঐতিহাসিক 'নাসিরকোট' গ্রামটিও। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নাসিরকোটের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল।

নাসিরকোট ঃ অবস্থান ও দুরত্ব ঃ বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিধন্য পুণ্যময় তীর্থভূমি ঐতিহাসিক 'নাসিরকোট' গ্রামটি চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। আবহমান বাংলার চির সবুজ রূপ বৈচিত্র্যে ঘেরা মাঠের পর মাঠ সোনালী ফসল আর আম, জাম, কাঠাল, সুপারী, অর্জুন, মেহগনি সমৃদ্ধ নানা জাতের পাখি ডাকা মায়াময় ছায়া ঢাকা সুনিবিড় শান্ত এ নাসিরকোট গ্রামটি জেলা সদর থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার পুর্ব-উত্তরে, হাজীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, মতলব উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পুর্বে ও কচুয়া উপজেলা সদর থেকে ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

নাসিরকোটের পথেঃ- নাসিরকোটের কোলে ঘুমিয়ে থাকা বাংলা মায়ের অকুতোভয় বীর সন্তানদের গৌরবময় স্মৃতি স্তম্ভটি দেখার এক দুরন্ত নেশা আজ বেশ কয়েক বছর যাবত আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততা আমাকে কঠিনভাবে পিষ্ট করতে লাগালো তাই সময় করে উঠতে পারছিলামনা। হঠাৎ করেই এবার নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভাবলাম যাবোই।

গত ১৭ নভেম্বর রাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, বন্ধু ইমরান সরকারসহ যাবতীয় প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করে পরদিন ১৮ নভেম্বর সকালেই যাত্রা করবো বলে ঠিক করলাম। অন্যদিনের চেয়েও সেদিন রাতে অনেক আগেই ঘুমোতে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই রাত ২ টা ৪৫ মিনিটের দিকে ঘুম ভেঙে যায়। বীরদের স্মৃতি স্ত ম্ভটি দেখার এক স্বর্গীয় আগাম আনন্দে আর ঘুম এলো না। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে পবিত্র ফজরের মধুর আজান শুনে বিছানা ছেড়ে ওঠে প্রস্তুতি শুরু করলাম। শীতের কনকনে ঠান্ডা পানিতে ঝাঁপিয়ে গোসল

শেষ করে ঘরে ফিরে পর্যাপ্ত কাগজ কলম ও ক্যামেরাসহ ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে সকাল ৭টা ২০ মিনিটে বেরিয়ে পড়লাম।

বন্ধু ইমরান সরকারসহ যখন সবকিছু চেক করে বোগদাদ এক্সপ্রেসে উঠলাম তখন সকাল ১০টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বাকিলা বাজারে পোঁছে গাড়ি থেকে নেমে যখন বেবিট্যাক্সি নিলাম তখন ঘড়ির কাটা ১১টা ছুঁই ছুঁই। অতঃপর গ্রামের ভাঙাচুড়া বিরক্তিকর রাস্তা পাড়ি দিয়ে যখন নাসিরকোট গ্রামে এসে পোঁছলাম। তখন ঠিক ১১টা ৩৯ মিনিট। স্মৃতিস্তম্ভটির অদুরে রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে আমরা সামান্য পায়ে হেঁটে মুহূর্তেই এসে পোঁছে গেলাম স্মৃতি স্তম্ভে।

নাসিরকোট ঃ নামকরণ; ইতিহাসঃ– ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কয়েক বছর পর ব্রিটিশ অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল নিয়ে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় রোসনাবাদ-ত্রিপুরা জেলা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর (পূর্ব পাকিস্তানের আওতাধীন) ত্রিপুরা জেলার নতুন নামকরণ হয় কুমিলা। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হলেও ত্রিপুরা জেলার কুমিলা নামকরণের পরে চাঁদপুর মহকুমা হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধে (পূর্ব পাকিস্তান) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর মহকুমা থেকে জেলাতে রূপান্তর লাভ করে। কালের ক্রম বিবর্তমান ধারায় জন্ম লাভ করা বর্তমানে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঐতিহাসিক নাসিরকোট গ্রাম। নাসিরকোট গ্রামের নামকরণের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে জানা যায়।
নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় কচুয়া উপজেলার আলিয়ারায় ক্ষত্রিয় রাজা অযোধ্যারাম ছেন্দা নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাকে দমনের জন্য সেনাপতি নাসির খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে অযোধ্যারাম পরাজয় বরণ করেন ও নিহত হন। কোট অর্থ দুর্গ। নাসির খানের নির্মিত দুর্গের জন্যই এই গ্রামের নাম হয় 'নাসিরকোট'। অন্যমতে, এ গ্রামটি দিয়ে সেনাপতি নাসির খান বিভিন্ন সময় আসা-যাওয়া করতেন ও পথিমধ্যে তিনি এখানে কখনো কখনো তাবু করে বিশ্রাম নিতেন। একটা সময় তিনি এখানে বসতি গড়ে তোলেন। তারপর ধীরে রাজ্য পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে এলাকাটি নাসির খানের দুর্গে পরিণত হয়। জনশ্রুতি রয়েছে- সেখান থেকেই গ্রামটি নাসির খানের দুর্গ হিসেবে পরিচিত লাভ করে। আর সেই থেকেই গ্রামটির নাম হয় নাসিরকোট।

মুক্তিযুদ্ধ ঃ ১৯৭১ ও নাসিরকোটঃ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের ইতিহাসে নাসিরকোট গ্রামটি একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় চির-অম্লান। আমাদের চাঁদপুর তথা মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুরের ইতিহাসে নাসিরকোট গ্রামটি মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস ছিলো মুক্ত অঞ্চল বা স্বাধীন। এখানে একটি দিনের জন্যও পাক হানাদার বাহিনী প্রবেশ করতে পারেনি। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকেই এখানকার মানুষজন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে বলে জানা যায়। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পরে যখন সারাদেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ঠিক তখন চাঁদপুর তথা বিভিন্ন জেলার মানুষজন এখানে আশ্রয় নিতে শুরু করে। কুমিলা হয়ে ভারতসহ বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করতে এই এলাকাটি ছিলো বিশেষভাবে নিরাপদ ও গুরুত্বপুর্ণ।

এখানকার প্রত্যেকটি বাড়িতে গড়ে ওঠে আশ্রয় ক্যাম্প, এলাকার ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আশ্রিত মানুষদের খাবার-দাবারসহ যাবতীয় কিছুর ব্যবস্থা করতেন সাধ্যমতো। এখানকার নাসিরকোট উচ্চ বিদ্যালয়টি ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের সাব-সেক্টর ক্যাম্প। যুদ্ধকালীন সময়ের প্রথম ও শেষের দিকে দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল হক পাঠান এখানে প্রায় ২/৩বার যাতায়াত করেছেন বলে জানা যায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই যুদ্ধের সব রকম তৎপরতাই নাসিরকোট গ্রামে চলতে থাকে।

যেমনঃ-(১) মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছুক যুবকদের তালিকা প্রণয়ন। (২) সামরিক কায়দায় প্রাথমিক ট্রেনিং প্রদান। (৩) গোপন পথে ভারতের আগরতলা ও অন্যান্য ক্যাম্পে প্রেরণ। (৪) গুপ্তচর বৃত্তির জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেদের নির্বাচন ও তথ্য সংগ্রহে প্রেরণ এবং (৫) বিভিন্ন যুদ্ধস্থলে নিহতদের আনয়ন, সমাধিস্থকরণ ও আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান। এ সাব-সেক্টর ক্যাম্পটির দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ শামসুল আলম। যুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকারদের সমন্বয় করে বিভিন্নভাবে পাক হানাদার বাহিনী নাসিরকোট গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। এছাড়া '৭১-এর মে মাসের দিকে এ এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তৎকালীন এম.এল.এ. জুনাব আলী মজুমদারকে প্রধান করে একটি সালিসি বোর্ড গঠন করা হয়েছিলো।

যার কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো সাব-সেক্টর (বর্তমান হাইস্কুলটি) ক্যাম্পটি থেকেই। যুদ্ধকালীন সময়ে ছোট-খাট ২/১টি অপরাধ সংঘটিত হলেও বস্তুত পক্ষে এ নাসিরকোট গ্রামের জনমানুষের অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, ধৈর্য ও বীরত্বপুর্ণ ভুমিকার কারণে পাক হানাদার বাহিনী এ গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি। যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নাসিরকোট গ্রামের মানুষদের গৌরবদীপ্ত করে দিয়ে স্মরণ করছে বার বার।

অন্তিম নিদ্রায় শায়িত ওরা ৯ জন বীর সন্তান ঃ আজ থেকে দীর্ঘ ৩৫ বছর আগে যে সকল দেশ প্রেমিক বীর সন্তান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের মুক্তিকামী মানুষকে মুক্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বুকের তরতাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন, সে সকল অসংখ্য নাম জানা-অজানা শহীদদের মাঝে প্রত্যন্ত পলী নাসিরকোটের সবুজ শ্যামল বুকে অন্তিম নিদ্রায় শায়িত জ্বলজ্বল করা নক্ষত্র খচিত শহীদ এম.এ.মতিন, পিতা-মৃত হাজী আঃ গফুর, রাজাপুরা, শাহ্রাস্তি, চাঁদপুর।

তিনি ৮ ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ (মতান্তরে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১) মতলব, হাজীগঞ্জ ও কচুয়া এই তিন উপজেলার সীমানায় অবস্থিত বোয়ালঝুরি খালের তীরবর্তী রঘুনাথপুর বাজারে জনাকীর্ণ অবস্থায়ই হাজীগঞ্জ বাজার থেকে আসা রাজাকাররা অতর্কিত হামলা চালালে প্রায় অর্ধশতাধিক নিরীহ জনতাসহ শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ মোঃ জয়নাল আবেদীন পিতা-মৃত সেকান্দর আলী, লোধপাড়া, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। শহীদ জয়নাল আবেদীন, পিতা-মৃত আঃ মজিদ মিয়া, রাধাসার, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। শহীদ আবু তাহের, পিতা- মৃত আঃ কাদের, সুবিদপুর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। শহীদ আঃ রশিদ, পিতা- মৃত মনোহর আলী, কীর্তন খোলা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

এ চারজন বীর চাঁদপুর মুক্ত হওয়ার পরদিন ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ হাজীগঞ্জ উপজেলার মুকুন্দসার গ্রাম দিয়ে পলায়নরত পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- ছেরাজল হক বেপারী, রাজারগাঁও, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। তিনি ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭১ চাঁদপুর বাবুরহাট এতিমখানা সংলগ্ন স্থানে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ এস.এম. জহিরুল হক, পিতা- মৃত সালামত উল্যাহ, সমেষপুর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। শহীদ ইলিয়াছ হুছাইন, পিতা- মৃত সৈয়দ আঃ রাজ্জাক, অলিপুর, (উয়ারুক) শাহ্‌রাস্তি, চাঁদপুর। এ দু'জন বীর ২৩শে অক্টোবর ১৯৭১ কচুয়া উপজেলার লাউকোরা গ্রামে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ এমদাদুল হক, পিতা- ফজলুল হক মাস্টার, সেন্দ্রা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

তিনি ২৩শে অক্টোবর ১৯৭১ কচুয়া উপজেলার গুলবাহার গ্রামে শাহাদাত বরণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ শামসুল আলম-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়। এছাড়াও আরো ২জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে সমাধিস্থলের নিকটবর্তী পুর্ব-দক্ষিণে সমাহিত করা হয়েছে। যাদের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। মহান মুক্তিযুদ্ধের ওরা ৯ জন বীর সন্তান দেশের জন্য নাসিরকোট গ্রামের সর্বস্তরের জন মানুষের পক্ষে দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে, জীবন বিলিয়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নাসিরকোটের ভুমিকাকে পুর্ণময় উজ্জ্বল করে দিয়ে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। ওরা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার।

নাসিরকোট ঃ বীরদের স্মরণে ঃ ঐতিহাসিক নাসিরকোটের বীরদের স্মৃতি ধরে রাখতে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশেষ করে মরহুম আব্দুল কুদ্দুসের উৎসাহ ও উদ্দীপনায়, ডাঃ শামসুল আলমের সাহসিকতা ও কঠোর শ্রমে জুনাব আলী মজুমদার, আব্দুল খালেক, মরহুম হেডমাস্টার নুরুল ইসলামসহ এলাকার সর্বস্তরের জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতায়, ব্রজেন রায় চৌধুরীর দানকৃত প্রায় ৫ একর জমির ওপর কুমিলা জেলা স্কুলের হোস্টেলের মুল কাঠামোর অংশটি এনে তৎকালীন সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী চাঁদপুরের স্বর্ণসন্তান মরহুম মিজানুর রহমান চৌধুরীর ২৫শে মার্চ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'নাসিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজ' নামক একটি বিদ্যাতীর্থ।

যা এখনো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবের জীবন্ত স্বাক্ষর বহন করে চলছে। এছাড়া এখানে শায়িত ৯ জন বীর সন্তানের সমাধির ওপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের লক্ষ্যে বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ডাঃ শামসুল আলম, কালী নারায়ণ লোধ ও ফরহাদ হোসেন রতনসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সক্রিয় তৎপরতায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুল কুদ্দুসের পুত্র প্রকৌশলী মরহুম আব্দুল হালিম-এর নকশা অনুসারে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তৎকলীন সরকারের ৩০ হাজার টাকার অর্থানুকুল্যে প্রাথমিকভাবে স্মৃতি সৌধটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয় ও পরে বিভিন্নভাবে তা সমাপ্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

পরবতীতে গত আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) শাসনামলে চাঁদপুর লেকের ওপর নির্মিত অঙ্গীকারের আদলে একটি ভাস্কর্য কলেজ ও স্মৃতি সৌধটির পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল আকৃতির দিঘির মাঝখানে নির্মাণের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের আন্তরিকতায় প্রকৌশলী মরহুম

আব্দুল হালিমের শ্রমে ঘামে মডেল পান তৈরি করে জমা দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে তিনি মন্ত্রীত্ব থেকে সরে দাঁড়ালে তা নির্মাণ তো দূরে থাক তার ফাইলটির হদিসও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কিন্তু স্বাধীনতার ৩৫ বছর পার হয়ে আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, শুধুমাত্র স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এখানে একটি কলেজ ও সমাধির ওপর নির্মিত সৌধটি নির্মাণ ব্যতীত সরকারি কিংবা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ভাবেই বীর শহীদদের স্মরণ রাখতে আর উলেখযোগ্য তেমন কিছু এখনো গড়ে ওঠেনি। কিংবা বীর শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাতে আজো রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কোনো ব্যক্তিবর্গের আগমন এখানে ঘটেনি।

বর্তমান নবীন ও প্রবীণদের ভাবনা, দাবি ও ক্ষোভ ঃ নাসিরকোট সমাধিস্থলের স্মৃতি সৌধটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রথমেই কথা হয় এ প্রজন্মের ফয়সাল মাহমুদ সাগর, মোঃ মাসুদ রানাসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রদের সাথে, যাদের সকলেই পড়াশোনা করছে নাসিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজের বিভিন্ন বর্ষে ও বিভিন্ন বিভাগে। এদের প্রশ্ন করলাম-তোমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ নাসিরকোটের অবস্থান সম্পর্কে কতোটুকু জানো? উত্তরে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যেখানে তাদের গর্বে বুক উথলে ওঠার কথা অথচ সেখানকার নব্য এ প্রজন্মদের মোটেও ধারণা নেই মুক্তিযুদ্ধে নাসিরকোটের ঐতিহাসিক ভুমিকার বিন্দুপরিমাণও, এ যেনো প্রদীপের নিচে অন্ধকার।

এদের আবার যখন প্রশ্ন করলাম- তোমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে কী ইতিহাস জানতে চাও না? এমন প্রশ্নের জবাবে ক্ষোভ-অভিমান ও দাবির সংমিশ্রণে বেরিয়ে এলো- কেউতো আমাদের কখনো জানাতে চায়নি- মুক্তিযুদ্ধে নাসিরকোটের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় সঠিক ইতিহাস। তবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বাস করি। আমরা চাই- পরস্পর বিরোধীমুক্ত ইতিহাস, চাই নাসিরকোটের বীর শহীদদের সঠিক মুল্যায়ন হোক।

তারপর আমরা ভর দুপুরে রৌদ্রে যখন ক্লান্ত হয়ে প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধকালীন সময়ের কমান্ডার ডাঃ শামসুল আলমের বাড়িতে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা চাইলাম। তখন কলেজ পড়ুয়া কামরুন নাহার লিজা আমাদের আন্ত রিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে গাঁয়ের আঁকা বাঁকা মায়াময় ছায়া ঢাকা পথ দিয়ে নিয়ে গেলেন সেখানে, আমাদের পরিচয় দেয়ার পর কমান্ডার সাহেব ওনার ঘরে বসতে বললেন। তারপর একান্ত আলাপচারিতার এক পর্যায়ে যখন প্রশ্ন করলাম- কেনো মুক্তিযুদ্ধ করে ছিলেন? এ নিয়ে আপনার বর্তমান ভাবনা ও চাওয়া-পাওয়া বা দাবি কী?

এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি আক্ষেপের স্বরে বলেন- কি জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছি তা আর বলে লাভ নেই। তবে যে দেশ গড়তে চেয়েছি তা আজো গড়তে পারিনি। আক্ষেপ আজ রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছে, আর মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে গেছে রাজাকার। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই শুধু চাওয়া-পাওয়া নাসিরকোটে ঘুমিয়ে থাকা এ বীর সন্তানদের যথাযথ মুল্যায়ন হোক। আমিতো আগেও আরো অনেকবার বলেছি আপনারা এখানে সবাই আসুন। এখানে ঘুমিয়ে থাকা শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করুন। আর চাই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিকৃতি থেকে রক্ষা পাক।

এছাড়াও কথা হলো- আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াদুদ ও মোঃ ফরিদ উদ্দিন মিজিসহ বেশকিছু প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে। ওনাদের সবারই বক্তব্য প্রায় একইভাবে এ রকম যে, আমাদের নাসিরকোটের বুকে ঘুমিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আপনারা তুলে ধরুন। বস্তুতপক্ষে প্রত্যক্ষ আলোচনায় তাদের ভাবনা, ক্ষোভ ও দাবিগুলো যেনো তাদেরই প্রাণের স্পন্দন হয়ে ধরা দেয়।

শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস- ঐতিহ্য, খেলাধুলা ও অন্যান্য ঃ এক সময়কার সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক উর্বর ভূমি সুর-সঙ্গীত, অভিনয়, রাত্রিকালীন পুঁথিপাঠ, পালাগান ও খেলাধুলার জমজমাট আসরের নাসিরকোটের এখন আর নেই আগের দিনের ঐতিহ্য।

শিক্ষাঃ এখানকার শিক্ষার হার আগের চেয়েও অনেক বেশি আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট জনসংখ্যার ৪৫% থেকে ৫০% লোক শিক্ষার আলো দেখলেও বাকিরা এখনো রয়ে যাচ্ছে শিক্ষার প্রদীপের নিচে। এদের শিক্ষিত করে তুলতে কোনো রকম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি কারোই। একটি প্রাইমারিও হাই স্কুল এবং একটি কলেজ এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে লেখাপড়া করার পথ সুগম হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সংকট এবং তথ্য প্রযুক্তির সাপোর্ট না থাকায় শিক্ষার মান ততোটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

তাছাড়াও এখানকার শিক্ষার মান উন্নয়নে কলেজটির নিজস্ব কিছু ফর্মুলা ব্যতীত তেমন কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো নয়। ছেলেদের পাশাপাশি এ গ্রামের মেয়েরাও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক কু-সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে অনেকটা পথ এগিয়ে, যা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক। শিক্ষার আধুনিকায়ন পদ্ধতিতে পাঠদান ও শিক্ষা উপকরণ সংকট দূরীকরণ এবং সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির স্পর্শ পেলে এখানকার শিক্ষার হার ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মানও বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময়ী উচ্চ আসনে এ গ্রামের সন্তানরা তাদের স্থান সৃষ্টি করে নিতে পারবে।

সাহিত্য ঃ অতীতের সাহিত্য ক্ষেত্রে বিখ্যাত নাসিরকোটের এখন আর নেই আগের দিনের সেই ঐতিহ্য। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নাসিরকোটের এ উর্বর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন চাঁদপুর তথা কুমিল্লা সাহিত্য অঙ্গানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল কুদ্দুস। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ছাড়াও তিনি সুদুর আমেরিকাতেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার লেখনী কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রগতির আলো জ্বালাতে সংগ্রামে লিপ্ত হন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ভূষিত হন 'সাহিত্য রত্ন ও স্বর্ণ পদকে' সম্পাদনা করেন- 'কুমিল্লা জেলার ইতিহাস'। এছাড়াও তার উলেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- 'শহর কুমিল্লার ও কুমিল্লার কৃতী সন্ত ানদের জীবন আলেখ্য', 'কুমিল্লার স্বরণীয়-বরণীয়'।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে 'একুশে পদকে' ভূষিত করেন। এ মহান ব্যক্তি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। অথচ নাসিরকোটে জন্ম নেওয়া স্ব-প্রতিভায় ভাস্বর এমন একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক, প্রগতিশীল ব্যক্তির গাঁয়ে জন্ম নেয়নি এ প্রজন্মের কোনো তরুণ সাহিত্যিক বা সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন করে কারো অবদান বা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি।

সংস্কৃতি ঃ- এক সময় এখানে হতো যাত্রা, থিয়েটার, পালাগান, পুঁথি পাঠের আসরসহ নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কয়েক যুগ ধরে হারিয়ে গেছে তাদের নিজস্ব সে সংস্কৃতির উৎসব ধারা।

এখানে বর্তমানে স্থানীয় নাসিরকোট শহীদ স্মৃতি কলেজের উদ্যোগে শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাÊ নিজস্ব পরিসরে পরিচালিত হলেও তা শুধুই কলেজ পর্যন্ত সীমাবব্দ্ধ এবং তার প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে তেমন করে গিয়ে পড়ছে না। যার ফলে এখান থেকে ওঠে আসছেনা বহুদিন ধরে সাংস্কৃতিক অঙ্গানে সৃষ্টিশীল কোনো ব্যক্তি বা তাদের কর্মকাÊ। এতে করে এখানকার মানুষজন মানসিক চাহিদা মিটানোর অন্যতম মাধ্যম সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চা বিহীন হয়ে পড়েছে নির্জীব ও অলস।

ইতিহাস-ঐতিহ্য ঃ মায়াময় অপরূপ রূপের মাধুর্যে ঢাকা ঐতিহাসিক নাসিরকোট গ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্য সেনাপতি নাসির খানের বিচরণে ধন্য। এ ভূমিটির সম্পর্কে প্রায়ই এখানকার মানুষজন অজ্ঞ। সেনাপতির সেই দুর্গ ও তার অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সাথে সাথেই যেনো বিলীন হয়েছে তার কিংবদন্তী। ২/১জনের ভাসা ভাসা কিছু ধারণা থাকলেও কেউই জানে না তার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে এর স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় হারিয়ে যেতে বসেছে। হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য'র স্বর্ণময় কাহিনী।

খেলাধুলা ঃ খেলাধুলায় নাসিরকোট এক সময় ছিলো বেশ জমজমাট। বিশেষ করে ফুটবল খেলায় মাতোয়ারা হতো সবাই। এছাড়াও হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্দা, কাবাডিসহ বেশ কিছু খেলাধুলায় মেতে ওঠতো এখানকার সাধারণ মানুষ। বছরের একটা সময় বিশেষ করে অগ্রহায়ণের ফসল ঘরে তোলার পর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে এখানে ফুটবল খেলার ধুম পড়ে যেতো। এ গাঁয়ের সন্তানরা স্থানীয়ভাবে ও উপজেলা পর্যায়ে বেশ কয়েকবার খেলাধুলায় তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন সফলভাবে। কিন্তু অবাক হতে হয়, বর্তমানে খেলাধুলায় অতীত ঐতিহ্যর ছিটে ফোঁটাও নেই। আগের মতো ঢাক ঢোল পিটিয়েতো নয়ই, দায়সারা গোছেও তেমন কোনো খেলাধুলার ভিড় এখন আর পড়ে না।

অন্যান্য ঃ এ গ্রামে একটি সময় 'নাসিরকোট সেবা সংঘ' নামক একটি সমাজ কল্যাণমুলক সংগঠন থাকলেও বর্তমানে অতীতের মতো নিজস্ব ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই সমাজের কল্যাণমুলক প্রত্যাশা পুরণের বদলে পঞ্জুত্ব বরণ করেছেন বহুদিন ধরে। এক সময় এখানকার মানুষজন বর্ষাকালে মাছ ধরার মহোৎসবে মেতে ওঠতো ও শীতকালে হরেক রকম পিঠা পায়েস তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো।

পরিশেষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ গাঁয়ের নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস- ঐতিহ্য, খেলাধুলাকে ধরে রাখতে কেউই তেমনভাবে এগিয়ে আসছে না। আর যার ফলে সেখানকার নব্য এ প্রজন্মরা জানে না তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যর একাল-সেকাল। কালের নির্মম কষাঘাতে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এ চরম উন্নয়নের যুগের এখানকার মানুষজন হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এ যেনো ইতিহাসের অপমৃত্যু।

নাসিরকোট ঃ তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয় ঃ নাসিরকোট শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থলের স্মৃতি সৌধটি আমাদের জাতীয় গৌরবের পীঠস্থান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী সকল প্রজন্মের সংগ্রামী দীক্ষার তীর্থভূমি।

আমাদের জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরীসীম। আমাদের মহান মুক্তির সংগ্রামের ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের নীরব স্বাক্ষী বহনকারী এলাকাটি সর্বমহলে পরিচিত করে তুলতে প্রয়োজন আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

এখানকার ইতিহাস ঐতিহ্যকে কালের অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে মুক্ত করে নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরা প্রয়োজন। চাঁদপুরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলার স্মৃতি চারণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে নাসিরকোটের ভূমিকাকে তুলে আনা জরুরি। এছাড়াও নাসিরকোটের মাটি ও মানুষকে নিয়ে আগামী বছর করা যায় বিজয় মেলা, ক্রীড়ানুষ্ঠান, পিঠাৎসব, নৌকা বাইচ, সাঁতার, পল্লীগীতি, জারি-সারি, নৃত্যকলার জমজমাট আসর। করা প্রয়োজন নাসিরকোটের বীরদের স্মরণে 'নাসিরকোট দিবস' উদ্‌যাপন, আয়োজন করা যায় 'শহীদ স্মৃতি ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট', এই শীতেই চালু করা যায় 'ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট'।

স্বাধীনতার ও বিজয় দিবসে করা প্রয়োজন বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। গড়ে তোলা যায় 'পর্যটন কেন্দ্র ও জাদুঘর'। উন্নয়নের ছোঁয়া প্রয়োজন এলাকার রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার। তবেই নব্য প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মরা জানবে নাসিরকোটের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যর সকল কাল।
আর দেশের সম্ভাবনাময়ী নব্য প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মদের স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করে সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে সমাজের দায়িত্বান ব্যক্তি হিসেবে আমাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে এখুনি এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় স্বাধীনতার রক্তঝরা আত্মাহুতির সকল কিছুই যে মুখ থুবড়ে পড়বে আর যুদ্ধাপরাধীদের নগ্ন-নৃত্য আমাদের অসহায় দর্শকের কাতারে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।
আপনি যেভাবে যাবেন ঃ আপনিও সুযোগ পেলে একবার ঘুরে দেখতে পারেন এলাকাটি। ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে যেতে হলে কুমিল্লা বিশ্বরোড পার হয়ে চাঁদপুর গামী স্পেশাল বা লোকাল যে কোনো গাড়িতে করে হাজীগঞ্জ পার হয়ে বাকিলা বাজার নেমে সরাসরি বেবিট্যাক্সি অথবা রিক্সা নিয়ে যে কাউকে বল্লেই আপনাকে সোজা নিয়ে যাবে নাসিরকোট শহীদ স্মৃতি সৌধ এবং চাঁদপুর সদর থেকে যেতে হলে ঢাকা বা কুমিল্লা গামী স্পেশাল বা লোকাল যে কোনো গাড়িতে গিয়ে বাকিলা বাজার নেমে বেবিট্যাক্সি অথবা রিক্সায় যেতে পারেন। আবার, আপনি ইচ্ছা করলেও সরাসরি গাড়ি নিয়ে গিয়ে সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিময় তীর্থ স্থান ঐতিহাসিক নাসিরকোট।

আমাদের ফিরে আসাঃ- সারাদিনের ব্যস্তময় কাজ শেষ করে যখন নিজ গন্তব্যস্থল চাঁদপুর আসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিলাম তখন শেষ বিকেলের আলো পশ্চিম আকাশে খেলা করছে। সেখানে যারা আন্তারিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের ছেড়ে পৃথিবীর চিরন্তন নিয়মে যখনি পা-বাড়ালাম তখন সূর্যটা পশ্চিম আকশের কোলঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়েছে আপন দেশে। তারপর ধীরে ধীরে নাসিরকোট গ্রামের শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে যখন চলতি আপন গতিতে। ঠিক তখনি অবচেতন মন থেকে গলাছেড়ে শ্রদ্ধাভরে বেরিয়ে এলো কালজয়ী সেই গান-
"এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলবো না।"

একাত্তরের গপ্পো

ফতেমোল্লা

পুবের দিকে মিষ্টি মধুর এক মায়াময় দেশ ছিল,
চাষী, কামার-কুমোর জেলে-তাঁতি সেথায় বেশ ছিল।
বারো মাসের তেরো পাবণ, টাক ডুমাডুম ঢাক ছিল,
লক্ষ বনলতা সেনের চোখে নীড়ের ডাক ছিল।
কদম-কেয়া, শাপলা-শালুক, দোয়েল-কোয়েল শিস্ ছিল,
ওৎ পাতা এক মীরজাফরি কালনাগিনীর বিষ ছিল।

পাক নামে এক অশ্বডিম্ব দেশ বানাবার হাঁক ছিল,
পাকের ভেতর নাপাক কিছু শুভংকরের ফাঁক ছিল।
চিন্তা-কথা-কাজে যে তার ষোল আনাই ছল ছিল,
ইসলামি নাম এর আড়ালে মোনাফেকি চলছিল।
পশ্চিমেতে সুখের প্রাসাদ, পুর্বেও ফুটপাত ছিল,
অপমানের অসম্মানের জঘন্য উৎপাত ছিল।
ওদের পকেট ভরলো যত, এদের ততই কম ছিল,
প্রতিবাদেও মিছিল হলেই অস্ত্র হাতে যম ছিল।

একাত্তরের বিস্ফোরণে দোয়েল-কোয়েল পুড়ছিল,
আকাশ জুড়ে হিংস্র দানব কালশকুনী উড়ছিল।
চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ফুলের কলি ঝরছিল,
জাতির মীরজাফরের হাতে লক্ষ মানুষ মরছিল।
লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা বোন, ধর্ষিতা মা কাঁদছিল,
চতুর্দিকে শুধুই রক্ত, লাশ ও আর্তনাদ ছিল।
এ কর্মকেই ওরা 'ইবাদত' যে মনে করছিল,
'নামাজ' পড়ে হত্যা করে আবার 'নামাজ' পড়ছিল।

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল,
কেয়ামতেই দেশের স্বাধীনতার নেয়ামত ছিলো।
এসব মীরজাফরের প্রতি খোদার অভিশাপ ছিল,
সেই সাথে এক বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল।

বিশাল বিপুল তূর্য্য হাতে বিশাল বিপুল শেখ ছিল,
বিস্ময়ে সব বিশ্ববাসী মুগ্ধচোখে দেখছিল।
জাতির মাথায় সোনার মুকুট তাজউদ্দিন তাজ ছিল,
তাজের হাতেই স্বাধীনতার প্রলয় শংখ বাজছিল।
জন্ম-সুখের উৎসবে দেশ মৃত্যু-ঝুঁকি নিচ্ছিল,
ষোলই ডিসেম্বর সুদূরে মিষ্টি উঁকি দিচ্ছিল।

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল
কেয়ামতের শেষে মীরজাফরের নাকে খৎ ছিল।
স্বাধীনতার সেই উৎসব, বিজয়ের সেই উল্লাসে,
অভ্রভেদী সে জাতকে আজ দেখলে চোখে জল আসে।

ধারাপাত

বদরুল আলম রতন

সময়ের
ধারাপাত শিখিনি আমি
শিখায়নি কেউ-
অথচ
আমার কাছে
জানতে চাও
একের দু-গুনে
হয় কত?

আমি ভুল সময়ে শিখেছি ভুল
নির্মিত স্বপ্নের
বিশ্বাস চূড়ায়
স্থবির বাতাসে, স্বপ্নেরা
উড়ায় ভুল বিজয়ের
লাল সবুজ নয় সাদা কালো
মলিন পতাকা।
শীর্ণ দৈন্য ইতিহাস
বাৎসরিক উৎসবে
খুব বেশী হলে
কুয়াশার মেঘ ছুঁয়ে
এক পলক দেখে নেয়
অন্তিম সূর্যের মুখ।

ইতিহাস
নিজেই শিখেনি কিছু
আমায় শিখাবে কি?
বাতাসে ভাসমান
গণতন্ত্র:
আমাকে হাসতেও দেয় না
আমাকে কাঁদতেও দেয় না
কেবলই ঠেলে দেয়
করাত সময় মুখে!
শত শত স্বপ্নের
শব দেহ বৃক্ষের
বুক ছেঁড়া ক্রন্দন
আকাশ বজ্রে
অশ্রু ঝরে চারুবনের
নীল আকাশে।

স্বাধীনতা এবং বিজয় মাসে’০৯

দেওয়ান আবদুল বাসেত

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে
রক্ত দিয়ে বিজয় পেলাম
এর পরে আর কী জয় পেলাম?
এ মাসে ফের বিশ্বসেরা
নোবেল শান্তি বিজয় পেলাম।
লাল সবুজের নিশান পেলাম
গ্রাম বাংলার দেশটি জুড়ে
ভুখা-নাঙ্গা কিষাণ পেলাম।

আর কি পেলাম
আর কি পেলাম?
বোমাবাজ আর বেকার পেলাম
হাজার কোটির ‘মেকার’পেলাম!!

উন্নয়নের জোয়ার-ভাটা
দেশ-জনতা বলির পাঠা!
দেশকে ঠেলে অন্ধকারে
তেমন ‘কেয়ার-টেকার’ পেলাম!

রাষ্ট্রপতির আকাল দেশে
দলপতির ভুতই পেলাম,
রাষ্ট্রদুতও পাইনা বিদেশ
শুধু দলের দুতই পেলাম!।

আর কি পেলাম, আর কি পেলাম?
পাক হানাদার দস্যু তনয়
দেশদ্রোহী সব খাশি পেলাম,
তার গাড়িতে বাংলা নিশান
জীব শুকরের হাসি পেলাম।

চিম্‌টি মেরে নিজকে বলি
সত্যি জেগে বসা আছি?!
কেম্‌নে উড়ে নাকের ডগায়
নর্দমার ওই মশামাছি!?

১২ডিসেম্বর ২০০৬ইং

পথের কাব্য একাত্তরের

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

নয় মাসে কতমানুষ হেঁটে গেল বহু দুর, রক্ত রাঙা এই পথ ধরে দুর সুদুর
যাওয়ার সময় স্মৃতি চিহ্ন এঁকে গেল পল্লীর ক্যানভাসে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে
কত মানুষের হাসি-কান্না মিশে গেলো এই পথের পবিত্র ধুলো বালিতে
কেউ কেউ রেখে গেল পথের ধারে, অচেনা লোকালয়ে প্রিয়জন স্বজনকে
কেউবা আবার পথ থেকেই কুড়িয়ে নিলো অচিন কোন প্রিয় মুখ
ঘরের পিছুটান ভুলে কত মানুষ হেঁটে গেল এই পথ ধরে যুদ্ধ প্রান্তরে
এই পথ ধরেই জন্ম নেবে নতুন ইতিহাস, মুক্তিসেনা, যোগ দেবে আসন্ন সমরে
কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ ক্রমশঃ বিশালতা পাবে, আলোকিত দিনে ওরা ফিরবে ঘরে
এই পথ আবার মুখরিত হবে, মুক্তিসেনার পদভারে, থর থর করে কম্পিত হবে
চুরি যাওয়া সবুজ আসবে ফিরে বাংলার প্রতি লোকালয়ে প্রতি ঘরে ঘরে
নিঃস্বব্দতা হারিয়ে যাবে, সোনালী সময় তার ডানা ফেলে স্বাধীনতাকে ছোঁবে
হৃদয়ে গভীর উষ্ণতা আঁকড়ে ধরে প্রিয়া বলবে তার জীবনের দুঃখের কথা
জোৎস্নারাত এই পথ ধরেই উদোম কৃষ্ণচুড়ার অধরে আবার রাখবে তপ্ত ঠোট
উষ্ণতা ছড়িয়ে যাবে প্রতিজনে, স্বাধীনচেতা নীল চোখের অশ্রু নীলান্তে হবে একাকার
যাচিত বর্ষার ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিগুলো ঘরের চালে আবারো তুলবে সুর
এই পথ ধরে স্বাধীনতা আসবে,
আসবে দরী,
আসবে হৃদয়
আসবে আবেগী স্বাধীনতা।

চাঁদপুর, বাংলাদেশ।

সমাপ্ত